শিবশংকর তান্ত্রিক ও বাউড়িহির পিশাচ

নেহা কর্মকার

শিবশঙ্কর তান্ত্রিক ও বাউডিহির পিশাচ

নেহা কর্মকার

KHOAI

শিবশঙ্কর তান্ত্রিক ও বাউডিহির পিশাচ

Shibsankar Tantrik O Baudihir Pishachas

প্রথম ইবুক প্রকাশ

ডিসেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ :

পিপাসা পাল

মুদ্রক

প্রিন্ট লিটিক্যাল (মো : ৯০০৭৮৬৪৮৯০)

প্রকাশক

রোশনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

'খোয়াই প্যালিশিং হাউস', বেহালা, কলকাতা - ৬০

বিঃ দ্রঃ — লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক, বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, বা পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সূচি

// ১ //

// ২ //

// ৩ //

// ৪ //

// ৫ //

// ৬ //

// ৭ //

// ৮ //

// ৯ //

// ১০ //

// ১১ //

// ১২ //

// ১৩ //

// ১৪ //

// ১৫ //

// ১৬ //

// ১৭ //

// ১৮ //

// ১৯ //

// ২০ //

// ২১ //

// ২২ //

// ১ //

স্টেশন থেকে নেমে দ্রুত পায়ে বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করলেন বিশ্বম্ভর চাটুজ্যে। এই কয়েক সপ্তাহ হল তার বড়ো মেয়ে স্বরনিকার বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। দুদিন আগে কলকাতায় তার মেয়ের শ্বশুর বাড়িতেই গেছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে। ভেবেছিলেন সেদিনই ফিরে আসবেন। কিন্তু মেয়ের জোড়ের কাছে হার স্বীকার করেন। তবে একদিন কাটতে না কাটতেই তার প্রাণ হাঁসফাঁস করতে থাকে নিজের বাড়িতে ফেরার জন্য। যতই হোক সেই ছোটো থেকে গ্রামের সবুজ দেখে বড়ো হয়েছেন, গ্রামের মুক্ত স্নিগ্ধ বাতাসে খেলে বেড়িয়েছেন, সেখানে কলকাতায় দূষিত বাতাস আর বড়ো বড়ো কংক্রিটের দানবের মাঝে তার প্রাণশক্তি যেন ফুরিয়ে আসছিল। যেই মুহূর্তে এই গ্রামের শান্ত বাতাস তার কপাল ছুঁয়ে গেল মনে হল যেন এক ভারী পাথর তার বুক দিয়ে নেমে গেল। প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়ে নিলেন বিশ্বম্ভর।

তবে স্টেশন থেকে নেমে গ্রামের পথ ছুঁতেই বুঝতে পারলেন বেশ দেরি হয়ে গেছে। চারিদিকটা একেবারে শুনশান হয়ে আছে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে আছে আশপাশ। গ্রামেগঞ্জে রাত ৮টার মধ্যেই সবাই খেয়ে শুয়ে পড়ে। এখন তো দেখে মনে হচ্ছে গভীর রাত। যদিও তিনি এটা জানেন না যে কটা বাজে, তাও আন্দাজ করে যা বুঝলেন ওই রাত ১১টার কাছাকাছি। তার মধ্যে ট্রেনটাও লেট করেছে আজ, নাহলে অনেক আগেই পৌঁছে যেতেন।

বিশ্বম্ভরের মনটা একেবারে বিরক্তিতে ভরে উঠল, একে তো এত দেরি তার ওপর একটাও ভ্যান বা রিকশাওয়ালাকে দেখতে পেলেন না কোনোদিকে।

“এত রাতে এখন হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে? ধুর!” একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে ট্রেন আর সমস্ত ভ্যান, রিকশাওয়ালাদের উদ্দেশে শাপশাপান্ত করে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

আজ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা কোনোটাই নয়। পরিষ্কার আকাশে আধখানা চাঁদের আলোয় যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতেই আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন বিশ্বম্ভর। আর মিনিট পনেরো মতো হাঁটলেই গ্রামের প্রধান সীমানাটা পড়বে। স্টেশন থেকে নেমে কিছুটা ভেতরের দিকে হেঁটে আসলে দুপাশে খোলা মাঠ পড়ে, এই মাঠ পেরোলেই গ্রামের প্রধান সীমানা। তবে এই মাঠকে মাঠ না বলে ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছোটোখাটো একটা জঙ্গল বলা চলে।

এমনিতে বিশ্বম্ভর চাটুজ্যে তার ডাকাবুকো স্বভাবের জন্য বেশ পরিচিত এই গ্রামে। খুব

সহজে তিনি খুব একটা ভয় পান না। তা ছাড়া তিনি ভীষণই নাস্তিক প্রকৃতির। ভূত তো বাদই থাক ঠাকুর-দেবতাতেও বিশ্বাস নেই তার। কিন্তু আজ এই নিশুতি রাতে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝে একা একা হেঁটে আসতে তার বেশ একটা অস্বস্তি হচ্ছে। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছেন এতক্ষণ ধরে হেঁটে আসলেও কোনো ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে না, এমনকি কোথাও কোনো কুকুর বিড়াল বা কোনো প্রাণীর সাড়াশব্দটুকুও নেই। চারিদিকটা বড়ো বেশিই নিঃশব্দ যেন আজ। শুধু আজ বললে ভুল হবে বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রামে এরকমই পরিবেশ। সবাই যেন একটু বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে, সন্ধে নামতে না নামতেই সবাই ঘরে ঢুকে দোর দিচ্ছে। তার অবশ্য একটা কারণ রয়েছে কিন্তু সেই কারণকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ বিশ্বম্ভর।

বেশ কিছু দিন আগে এই গ্রামের সবচেয়ে পুরোনো একটা বটগাছ তলার নীচে ভবা পাগলার মুণ্ডহীন ক্ষতবিক্ষত দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। ছিন্নভিন্ন দেহ, শুকিয়ে কাঠ। হাত, পা, কোমর সব বেঁকানো। সে দেহ নাকি এতটাই ভয়ঙ্কর অবস্থাতে ছিল যে ওখানেই অনেকে মূর্ছা গেছে। কেউ কেউ তো আবার কিছু না জেনেই বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতো দাবি করে বসল যে এটা কোনো ভয়ানক পিশাচের কাজ, গ্রামে কারোর কুদৃষ্টি লেগেছে। প্রথমেই বলেছি বিশ্বম্ভর চাটুজ্যে বড়োই নাস্তিক মানুষ, তাই তিনি এই অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের কথাকে একপ্রকার ছো মেরে উড়িয়ে দিলেন।

শুধু ভবা পাগলা নয়, দুদিন আগে মহেশকেও একই অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল গ্রামের এক পুরোনো কালভৈরবীর মন্দিরের পাশে হোগলা বনের ধার থেকে। কে, কবে, কী উদ্দেশ্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল তা কেউ জানে না, কেউ যায়ও না ওইদিকে। মহেশ হল একেবারে যাকে বলে জাত মাতাল, সারা দিনরাত গলা অবধি খেয়ে বসে থাকে। কোনো কাজ করে না, সারাদিন গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়ায় আর ভুলভাল বকে যায়।

মহেশকেও ঠিক একইভাবে মুণ্ডহীন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। দেহ সেই আগের মতোই শুকিয়ে কাঠ। কেউ বুঝতে পারছিল না যে এত তাড়াতাড়ি দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে কী করে। মহেশের দেহের পাশেই কাটা মাথাটা পড়েছিল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, যেন কী দেখে সে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল আর তাতেই তার প্রাণবায়ু ফুরিয়েছে। কাটা মাথা বললেও ঠিক বলা হবে না, কারণ এদের দুজনের কারোর মাথাই কাটা নয়, ছেঁড়া! হ্যাঁ, কেউ যেন ভীষণ অমানুষিক এক চাপে ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছে দেহ। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল মানুষ দুটোকে ওই নৃশংসভাবে খুন করা হলেও একফোঁটা রক্ত কোথাও

লেগে ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে।

বিশ্বম্ভর এইসব কোনো কিছুই নিজের চোখে দেখেননি, স্বভাবতই সে পুরো ঘটনাকেই গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের রসিয়ে-কষিয়ে করা গাঁজাখুরি গল্প বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রামের মানুষ তো পরপর এরকম দুটো ঘটনায় ভীষণই ভয় পেয়ে আছে। কিন্তু বিশ্বম্ভর এইসব ঘটনাকে পিশাচের কাণ্ডকারখানা মানতে নারাজ। তার স্পষ্ট বক্তব্যই হল গ্রামে কোনো ভয়ানক ডাকাত দলের উপদ্রব ঘটেছে। তারাই এমন নৃশংস খুনগুলো করে গ্রামের মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করছে, যাতে তাদের কার্যক্রম তারা নিভৃতে চালিয়ে যেতে পারে।

অন্ধকারে হেঁটে আসতে আসতে বিশ্বম্ভর এইসব জিনিস নিয়েই চিন্তামগ্ন ছিলেন। তার ভাবনায় বাধা পড়ল, আকাশ হঠাৎ করেই কালো মেঘের চাদরে ঢেকে গেছে। সেই চাদরে ঢাকা পড়েছে আধ ফালি চাঁদটাও। ফলে যেটুকু নামমাত্র আলোয় তিনি রাস্তা বুঝে আসছিলেন সেটাতেও বিঘ্ন ঘটল। এই অন্ধকারের পাকদণ্ডী বেয়ে রাস্তা চিনে যাওয়া আর ভুলভুলাইয়ার মাঝে পথ হারানো একই ব্যাপার এখন। এবারে নিজের ওপরই তিনি বেশ রুষ্ট হলেন। স্টেশন মাস্টার তাকে পই পই করে বারণ করেছিলেন এত রাতে বাড়ি না যেতে। আজকের রাতটা অন্তত স্টেশনে থেকে যেতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি কিন্তু ওই যে বলে না কপালে নেই ঘি ঠকঠকালে হবে কী! এখন এই অন্ধকারে রাস্তা চিনে যেতে যেতে না তিনি পথই গুলিয়ে ফেলেন। রাতে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়! এখন স্টেশন থেকেও অনেকটা দূরে এসে গেছেন তাই ওইদিকে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। এইদিকে রাত বাড়ছে। রাতের বাতাস আরও একপ্রস্ত শীতল হয়েছে। এই শীতল বাতাসের ছোঁয়ায় শরীরের সমস্ত হাড়গুলো যেন কেঁপে উঠছে। এই ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের জন্যই হোক আর গ্রামের ইদানীং পরিবেশের জন্যই হোক, বিশ্বম্ভরের মনের মধ্যে কোথাও যেন হালকা একটা ভয়ের উদ্রেক হল। সে হাঁটা শুরু করেছে ঠিকই কিন্তু মনে হচ্ছে কেউ যেন তার পিছনে, কখনও পাশে হেঁটে চলেছে। দুবার পিছন ফিরে আশপাশটা দেখার চেষ্টা করলেন ঠিকই কিন্তু এই অন্ধকারে কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হল না। তিনি হাঁটার গতিবেগ বাড়ালেন। এবারে আর একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনে তিনি থমকে গেলেন। আওয়াজটা খুব মিহি, সূক্ষ্ম। খানিকটা বাঁশির মতো। যেন একটা সুর বেজে চলেছে একনাগাড়ে। কিন্তু এই সুরও বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। এই সূক্ষ্ম রিনরিনে সুর বেশিক্ষণ শুনলে মাথা দপদপ করে ওঠে, মাথার শিরাগুলো ফুলে উঠে ফেটে যেন বেরিয়ে আসতে চায়। বিশ্বম্ভরেরও এখন ঠিক একই অবস্থা, তার মাথা যন্ত্রণায় মনে হচ্ছে যেন এবারে ফেটে যাবে। দু হাত দিয়ে যতটা সম্ভব তিনি নিজের কানকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন কিন্তু লাভের লাভ

কিছুই হচ্ছে না। যতই তিনি নিজের হাতের জোড় বাড়ান ততই যেন সেই সর্বনাশী সুর তার মাথা কেটে বসে যেতে চায়। উফ কী অসহ্য যন্ত্রণা! বিশ্বম্ভরের আর উঠে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তি থাকে না। তার চোখ ঝাপসা ঠেকে, অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসে, একটা সময় তার চোখও বন্ধ হয়ে যায়।

কতক্ষণ ওরকম অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন তা জানেন না কিন্তু চোখ খুলতেই আবারও চোখের সামনে অন্ধকার দেখায় ধড়ফড় করে উঠে বসেন বিশ্বম্ভর। তার মাথার একপাশ তীব্র যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে। আকাশ এখন খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে আগের থেকে। চাঁদের আলোয় আবার আশপাশটা একটু দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এবারে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তীব্র বেগে গ্রামের সীমানার দিকে ছুট লাগালেন বিশ্বম্ভর। ছুটছেন তো ছুটছেন, কিছুতেই যেন রাস্তা শেষ হতে চায় না, যতই তিনি জোড়ে দৌঁড়াতে চান না কেন কিছুতেই গ্রামের সীমানা যেন তার কাছে ধরা দেয় না। কিন্তু এ কী! কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ভয়াল জিনিসের উপলব্ধি করতে পেরে বিশ্বম্ভরের সারা শরীর দিয়ে যেন এক তীব্র আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায়। এ তো সেই জায়গায় তিনি ফিরে এসছেন যেখানে কিছুক্ষণ আগেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এ কী করে সম্ভব! আবার ছুট লাগালেন তিনি গ্রামের সীমানা লক্ষ করে কিন্তু বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। এবারে তার সমস্ত কিছু যেন গুলিয়ে যেতে শুরু করে। তিনি বুঝতে পারছেন যে কোনো এক ভয়ানক মায়াজালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। গ্রামের লোকেদের কথাকে অশিক্ষিতদের বানানো গল্প বলে যে তিনি মস্ত বড়ো ভুল করেছেন তা তিনি ভালোই টের পাচ্ছেন, তবে কি তাকেও এবারে!

বিশ্বম্ভর আবার প্রাণপণে ছুট লাগান। যতক্ষণ তার শরীরে প্রাণ আছে তিনি কিছুতেই থামবেন না। যাই হয়ে যাক, তার মৃত্যু কোনোমতেই এতটা নৃশংস হতে পারে না। কিন্তু অত্যাধিক মানসিক চাপে তিনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে তার বয়স এখন ৬০ পেরিয়েছে। বিশ্বম্ভরের ডাকাবুকো যুবক তকমা অনেকদিন আগেই ঘুচে গেছে। একটা সময় তিনি ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার হাত পা কাঁপতে শুরু করে। চোখ ঝাপসা ঠেকে। তাতেই তিনি বুঝতে পারেন সামনের অন্ধকারের মধ্যে যেন আরও একপ্রস্ত অন্ধকার এসে জমাট বেধেছে। দুবার চোখ পিট পিট করে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলেন বিশ্বম্ভর আর পরমুহূর্তেই সামনের দৃশ্য বুঝতে পেরে তার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল। বিশ্বম্ভরের হাত পাঁচেকের মধ্যেই একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। তার শরীরের কোনো অস্তিত্ব নেই। শুধুই যেন কালো ভাসমান একখণ্ড ধোঁয়া। কিন্তু তার শরীরের একেবারে ওপরের অংশে ওই চারটে

বিন্দুর মতো জ্বলজ্বলে জিনিসগুলো কী? একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যায় ওই জ্বলজ্বলে জিনিসগুলো আর কিছুই নয়, চারটে চোখ! হ্যাঁ চারটে চোখ, মণিবিহীন চারটে চোখ যার রঙ কালচে সবুজ। চোখ দুটো যেন তীব্র জিঘাংসায় ভাটার মতো জ্বলছে আর তার সাথে হিংস্র শ্বাপদের মতো উঁকি মারছে কিছু ধারালো ছুঁচালো দাঁত। যা দিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো বস্তুকে একটানে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলা যায়।

অস্তিত্বহীন কালো ছায়াটাকে দেখে বিশ্বম্ভর নিথর হয়ে গেলেন। তীব্রভাবে চিৎকার করতে চাইছেন তিনি কিন্তু কেউ যেন তার গলা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে। বিশ্বম্ভরের কপালের ঘাম বেয়ে এখন চোয়ালের নীচে এসে ঠেকেছে। সামনের ছায়ামূর্তির দিক থেকে আবার সেই সূক্ষ্ম সুর ভেসে আসে। বিশ্বম্ভর মাথার রগ চেপে ধরে, তার মাথার সমস্ত শিরা ফুলে উঠেছে। ভেতর দিয়ে কেউ সেগুলো যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। ছায়ামূর্তি এবারে ধীরে ধীরে বিশ্বম্ভরের দিকে এগোতে শুরু করে, তার ধারালো দাঁতগুলো চাঁদের আলোয় চকচক করে ওঠে।

// ২ //

অনেকক্ষণ ধরে সুরটা কানে আসছিল বীরেনের। অনেক দূরে বলেই হয়তো খুব মিহি আর আস্তে। কিন্তু তাও এই পৈশাচিক সুর বীরেন বিলক্ষণ চেনে, তাই মটকা মেরে বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল সে। এরকম সুর বীরেন এর আগে দুবার শুনেছে। যে রাতে সে এই সুর শুনেছে তার পরেরদিন গ্রাম থেকে ওই ভয়ানক দেহ দুটো উদ্ধার হয়েছে। এই সুর যে অশুভ তা বীরেন অনেক আগে থেকেই বুঝেছিল। অনেকবার সে এই সুর গভীর রাতে স্টেশনের আশেপাশেও শুনেছে। যতবারই সে শুনেছে ততবারই দেখতে যাওয়ার জন্য উদ্ধত হয়েছে কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য টানে তার সাহস হয়ে ওঠেনি। ছোটোবেলা থেকেই বড্ড ভীতু বীরেন। স্কুলের প্রত্যেকটা ছেলে বীরেনকে রাগাত এই নিয়ে। কিন্তু বীরেন খুব একটা পাত্তা দিত না। সেই বীরেনের গভীর রাতে একা বেরানো তো দূরে থাক সামান্য ঠাকুমার মুখে ভূতেদের গল্প শুনলেই সারা রাত আর ঘুম হতো না। খালি চোখ চলে যেত জানলা দিয়ে বাইরে। মনে হতো কে যেন আছে, কে যেন ক্রমাগত দেখে চলেছে বীরেনকে যার অস্তিত্ব ভীষণই অশুভ। তাই রাতে আর বীরেনের সাহস হতো না বাড়ি ফেরার। স্টেশনেই থেকে যেত সে। বাউডিহি গ্রামের স্টেশনের একমাত্র স্টেশন মাস্টার এখন বীরেনই। মাস কয়েক আগে আগের যিনি স্টেশন মাস্টার ছিলেন তিনি রিটায়ার্ড হওয়ার পরেই বীরেন জয়েন করে। একটু বেশি বয়সে চাকরিটা হলেও সে খুশি ছিল। রাত্রিটা স্টেশনমাস্টারের জন্য বর্ধিত ঘরে কাটিয়ে পরের দিন সকালে বাড়ি যেত স্নান খাওয়াদাওয়া করার জন্য।

"আআআআ...!"

তীব্র কান ফাটানো আর্তনাদে বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসে বীরেন। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশের টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে গ্লাসের সমস্ত জল শেষ করে দেয় বীরেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ নিঃশব্দে বসে থাকে সে। এই আর্তনাদকারীর গলা সে বিলক্ষণ চেনে। কিছুক্ষণ আগেই সে এই গলার মালিককে বারণ করেছিল এত রাতে বাড়ি না ফিরতে। তার সাথে থেকে যেতে। কিন্তু বিশ্বম্ভরের চিরাচরিত ডাকাবুকো স্বভাবে যাতে কোনো ঘুণ না ধরে তাই জেদ করেই এত রাতে রওনা দিলেন গ্রামের দিকে। কী জানি কাল সকালে আবার একটা বীভৎস মৃতদেহ দেখতে হবে কিনা। হঠাৎ বীরেনের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। ওই সুর! আবার সেই পৈশাচিক সুর, এবারে যেন অনেকটা

কাছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখন।

"আহঃ!" মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে বীরেন। তার মাথার শিরাগুলো ফুলতে শুরু করেছে, যে-কোনো মুহূর্তে যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে বীরেনের, সমস্ত কিছু অন্ধকার হতে শুরু করে। তারপর সব নিশ্চুপ। পুনরায় নিস্তব্ধতায় ডুবে যায় বাউডিহি।

// ৩ //

সকালে মানুষের সম্মেলিত ডাকাডাকিতে হুশ ফেরে বীরেনের। প্রথমে কিছুই মনে করতে পারে না সে।

কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুতের গতিতে কাল রাতের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে যায় বীরেনের। কাল রাতে কখন সে অজ্ঞান হয়ে গেছে সে নিজেও জানে না। হয়তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বলেই বেঁচে গেছে বীরেন, নাহলে ওই পৈশাচিক সুর কাল রাতে বীরেনকেও ছাড়ত না। বাইরে লোকেদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বীরেন সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসে। হরি কাকাকে দেখতে পেয়ে ছুটে যায় তার দিকে।

"কী হয়েছে? সবাই এমন চিৎকার করছে কেন?" উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে বীরেন জিজ্ঞেস করে হরি কাকাকে। তার মনে কাল রাত থেকে যে ভয় চেপে বসেছিল সেই ভয়ই সত্যি হল। গ্রামের সীমানার কাছেই মাঠের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিশ্বম্ভরের মুণ্ডহীন বীভৎস ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ। সকালে গ্রামের কিছু লোক জঙ্গলে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারতে এলে তারা বিশ্বম্ভরের মুণ্ডহীন দেহ আবিষ্কার করে।

হরি কাকা বেশ তাচ্ছিল্যের সুরেই বলে ওঠে, "গ্রামে নির্ঘাত কোনো অপদেবতার ছায়া পড়েছে। এরকম নৃশংসভাবে খুন কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নাকি? কিন্তু গ্রামের কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ আছে না তারা তো সব বিজ্ঞানমনস্ক। তারা এসব ভূত-প্রেত মানতে যাবে কেন? বুঝবে বুঝবে যখন গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ এইভাবে একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন সবার টনক নড়বে", হরি কাকা এক নিমেষে কথাগুলো বলেই যাচ্ছিলেন কিন্তু বীরেনের তাতে কোনো মনোযোগ ছিল না তার মন এখন ভাবছে অন্য কথা। গ্রামে এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছে বেশিদিন হয়নি। বীরেন মন দিয়ে মনে করার চেষ্টা করে ঠিক কবে থেকে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। কী মনে পড়তেই বীরেন এক মুহূর্তের জন্য নিথর হয়ে গেল। "এই সমস্ত ঘটনা তো সেদিন থেকেই... হ্যাঁ সেদিন থেকেই... তো ঘটছে!" ফিসফিস করে কথাগুলো বলে ওঠে বীরেন। "তবে কি সেখান থেকেই কোনো অভিশাপ লাগল গ্রামে? ওঁর মৃত্যু কি তবে কোনো দোষ পেল? গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরেই তো সেদিনই সে..." ভাবতে গিয়েও থেমে যেতে হয় বীরেনকে। কথা কথাতে খেয়ালই ছিল না যে অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। একবার এক্ষুনি বাড়ি যাওয়া দরকার। কী

জানি মুনিয়া আর তার মা ঠিক আছে কিনা...

// ৪ //

হন্তদন্ত করে বীরেনকে বাড়ি ফিরতে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফেরে কমলার। সারা রাত সে মেয়েকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কোনোরকমে ঘুমানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনোভাবেই কমলা ঘুমোতে পারেনি। গভীর রাতের ওই পৈশাচিক আওয়াজ শুনেই সে বুঝেছিল আবার সেই অশুভ কিছুর আগমন ঘটেছে, কোনো অনিষ্ট না করে সে যাবে না। সেই আওয়াজ কমলাদের উঠোনের কাছ পর্যন্ত এসেই খানিকক্ষণের জন্য থেমে যায়। ক্ষনিকের জন্য কমলা ভেবেছিল হয়তো সেই অশুভ প্রেত বিতাড়িত হয়েছে। কমলার মনের কোণে একটা কৌতূহল উঁকি দেয়। মন বলতে থাকে একবার বাইরে গিয়ে দেখি। কিন্তু পরক্ষণেই বীরেনের সাবধানবাণী মনে পড়ে যায়, "রাতে যাই হয়ে যাক কমলা, দরজা ঘুণাক্ষরেও খুলবে না, যদি আমিও এসে ডাকি তবে তাও না, মনে রাখবে রাতে যে আসে সে কোনো মানুষ না!" সঙ্গে সঙ্গে দরজার খিলের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নেয় কমলা। হঠাৎ দরজার ওপাশে উঠোনের দিক থেকে একটা চাপা অট্টহাসি ভেসে আসে। মুহূর্তের জন্য কমলার সারা শরীর শিউরে ওঠে। ছুট্টে গিয়ে বিছানায় উঠে মেয়েকে জড়িয়ে কাঁপতে থাকে সে। ছোট্ট মেয়েটি মায়ের হঠাৎ এমন আচরণে প্রথমে হকচকিয়ে যায় তারপর কী যেন একটা বলতে যাবে ঠিক সেই সময় কমলা তার মুখ চেপে ধরে, ইশারায় বুঝিয়ে দেয় এখন কোনো কথা নয়।

বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সেই প্রেত আর তার অট্টহাসি মিলিয়ে এলে কমলা কিছুটা শান্ত হয়। বুকে জড়িয়ে রাখা তার মেয়ের দিকে চোখ যায় তার। কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে করে তাকে শুইয়ে দিয়ে নিজেও পাশে শুয়ে পড়ে কমলা। কিন্তু ঘুম আর আসে না। চোখ বন্ধ করতে গেলেই সেই প্রেতের হাসি যেন তার কানের কাছে বেজে ওঠে। ভোরের আলো ফুটতেই কমলা ঘরের থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে কিছু নিয়ে একটা হইহট্টগোল বেঁধেছে। সবাই কিছু একটা আলোচনা করতে করতে মাঠের দিকে ছুটছে। কাল রাতে আবার নাকি কে মারা পড়েছে। কমলার বুকের ভেতরটা হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকে। ভোলার মা কমলাদের প্রতিবেশী। কমলাকে বাড়ির দাওয়ায় ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি আর মাঠের দিকে না গিয়ে কমলার কাছে আসেন।

"কী গো কমলা, এরকম পানসে মুখ নিয়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছো?"

ভোলার মাকে দেখেই কমলা বলল, "দিদি তুমি একটু মুনিয়ার কাছে থাকবে? আমি

তাহলে একটু মাঠের দিকটায় দেখে আসতাম।”

“কেন গো, তুমি ওইদিকে যাবে কেন, তুমি কি...” চিন্তিত মুখে ভোলার মা জিজ্ঞেস করে।

“আসলে মুনিয়ার বাবা তো এখনও বাড়ি ফেরেনি তাই আর কি একটু দে... দেখে আস... আসতাম...”

কমলার কথা আটকে আটকে যায়। ভোলার মা বুঝতে পেরে তাকে আশ্বস্ত করে। আসলে শুধু কমলা নয়, রাতে যেই বাইরে থাকে তাদের বাড়ির লোকেদের আজকাল এইরকম দুশ্চিন্তা নিয়েই রাত কাটাতে হয়। কী জানি এবারে সেই প্রেতের পরের শিকার তার বাড়ির লোকই হবে কিনা!

মুনিয়াকে ভোলার মায়ের কাছে রেখেই কমলা ছুট দেয় মাঠের দিকে। ভীড়ের মধ্যে কোনোদিকেই বীরেনকে সে দেখতে পায় না। কমলা এবারে সত্যিই ভয় পায়। ধীরে ধীরে ভীড় ঠেলে এগোতেই সেই বীভৎস লাশটার দিকে চোখ যায় কমলার, সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর গুলিয়ে ওঠে তার। শরীর খারাপ লাগতে শুরু করে। এবারের লাশের অবস্থা আগেরগুলোর চেয়েও আরও খারাপ আরও নৃশংস। সবাই তাই নিয়েই বলাবলি করছে। লাশের পেট চিড়ে কেউ নাড়িভুঁড়ি বার করে দিয়েছে। সারা শরীরের সমস্ত জায়গা থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া। মুণ্ডটার মাথা থেকে ঘিলু বার করা। মুখটার একপাশ আধখাওয়া। সেখান থেকে রক্তে কিছুটা জায়গা লেপ্টে রয়েছে, শুধু শরীরে এক ফোঁটাও রক্ত নেই।

কমলা আর এইসব সহ্য করতে পারে না। ভীড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত বাতাসে কিছুটা শ্বাস নিয়ে নেয়। তারপর টলমল পায়ে বাড়ি ফিরে এসেই চোখেমুখে জল দেয়। কমলাকে ওই অবস্থায় ফিরতে দেখেই ভোলার মা ছুটে যায় কমলার দিকে। তারপর তাকে ধরে ধরে এনে ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে হাতপাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া দিতে থাকে। কথায় কথায় কমলা ভোলার মাকে বলে যে ওটা বিশ্বম্ভরবাবুর লাশ, দুদিন আগে ওঁকে কমলা দেখেছিল ওই পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই তিনি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কমলার চিন্তা আরও বাড়তে থাকে যখন দুপুর হয়ে গেলেও বীরেন বাড়ি ফেরে না দেখে। অবশেষে বীরেনকে দূর থেকে আসতে দেখেই কমলার ধড়ে যেন প্রাণ আসে। বীরেন এলে এবারে ভোলার মা তার বাড়ির দিকে রওনা দেয়। কাল রাতের সমস্ত ঘটনা কমলা বীরেনকে সবিস্তারে জানায়। বীরেনের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। কাল রাতে যে সেও ওই প্রেতের অস্তিত্ব টের পেয়েছে তা খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে যায় বীরেন।

// ৫ //

ধীরে ধীরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে থাকে বাউডিহি গ্রামে। পশ্চিমের আকাশ ক্রমশ কমলা বর্ণ ধারণ করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সেই কমলা বর্ণে লালের আভা এসে মিশে জানান দেয় যে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যেতে শুরু করেছে। এর মানে আর একটি রাত, আর একটা নৃশংস মৃত্যু। গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ এইরকম একটা পরিবেশের জন্য ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করতে শুরু করে। আগে যে গ্রামে সন্ধ্যা নামলেই প্রত্যেকটা বাড়ির তুলসীতলায় গ্রামের মেয়ে বউদের প্রদীপ জ্বালাতে দেখা যেত এখন তারাই সন্ধে নামতে না নামতেই ঘরের দরজায় খিল তুলে দেয়। গ্রামের অজয়দার চায়ের দোকানে এখন আর আগের মতো হারান খুড়ো, নগেন খুড়োদের চায়ের আড্ডাও বসে না। সন্ধের অন্ধকার নামার সাথে সাথেই মাঝিরা নৌকা ঘাটে বেঁধেই যে যার বাড়ির দিকে ছুট দেয়। সবাই প্রাণ যাওয়ার ভয়ে ভীত। গ্রামের আকাশে আর আগের মতো রংবেরঙের পাখি উড়তে দেখা যায় না, যেন হঠাৎ করেই তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ আগে ঝিঁঝি পোকার একঘেয়েমি ডাকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত, কুকুরগুলোর আচমকা চিৎকারে তিতিবিরক্ত হয়ে মাঝরাতেই তাদের তাড়াতে উদ্যত হতো, সেইসব হঠাৎই সব উবে গেছে। কোনো ঝিঁঝি পোকার ডাক নেই, রাতচড়া পাখির কর্কশ চিৎকার নেই, কুকুর বা বিড়াল কোনো প্রাণীর টু শব্দটুকুও নেই। পুরো গ্রামটা আস্তে আস্তে নিঃশব্দের অন্ধকারে ডুবে গেছে। এই নিঃশব্দই গ্রামের মানুষের কাছে সবচেয়ে আতঙ্কের। এই নিঃশব্দের মাঝেই হয়তো হঠাৎই বেজে উঠবে সেই পৈশাচিক সুর। আবার কেউ শিকার হবে ওই প্রেতের হাতে।

রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়।

প্রকাশ, মহেন, হারান, নগেন কেউই আজ বাড়ি ফেরে না। বলা ভালো শ্রীপতিবাবুই কাউকে আর ফিরতে দেন না। তিনি একা মানুষ। একাই থাকেন এই একতলা বাড়িতে। সঙ্গে থাকে রামু নামের একজন বয়স্ক কাজের লোক।

হারান ও নগেন দুভাই। কেউই বিয়ে করেনি। তাই বাড়ির প্রতি টান বিশেষ নেই। মহেনের স্ত্রীও মারা গেছে তা প্রায় ৫-৬ বছর হল। তার বাড়িতে আছে তার ছেলে, ছেলের বউ আর ৬ বছরের এক নাতি। ভরা সংসার হলেও ছেলে বা ছেলের বউ কেউই তেমন পোছে না মহেনকে তাই মহেনেরও বাড়ির প্রতি টান বিশেষ নেই। শুধু নাতির সাথেই একটু যা ভালো

সম্পর্ক। নাতি তো দাদু বলতে অজ্ঞান। কিন্তু তার মায়ের জন্য এখন চাইলেও দাদু বা নাতি কেউই আর কাছাকাছি আসতে পারে না। প্রকাশ এদের থেকে বয়সে একটু ছোটো। বয়স এখনও ৫০-এর কোঠা পার করেনি। তবে তার শারীরিক গঠনের জন্য তাকে খানিকটা বেশি বয়স্কই দেখায়। বাড়িতে তার মা, বউ আছে। তবে চিরকালই তার একটা বাউন্ডুলে স্বভাব। প্রকাশের মা ভেবেছিলেন হয়তো বিয়ে দিলে ছেলে ঠিক হবে, কিন্তু হয়েছে পুরো তার উল্টো। বিয়ে দেওয়ার পর প্রকাশের বাউন্ডুলামি আরও বেড়ে গিয়েছিল। অনেকে অনেক ভাবে বুঝিয়েছে কোনো লাভ হয়নি। অবশেষে সবাই হাল ছেড়ে দেয়। ধীরে ধীরে প্রকাশের এই স্বভাব নিয়েই তাকে সবাই মেনে নেয়।

সকালের ওই বীভৎস দেহ দেখার পর কেউই আর ঠিকমতো খেতে পারেনি। এখন রামু এসে এক গামলা মুড়ি তেল, লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে মেখে ওদের দিয়ে গেল। দুপুরের দিকে ওরা সবাই এসে জড়ো হয়েছিল শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে। আগে পরিস্থিতি ঠিক ছিল যখন তখন রোজ গ্রামের পুরোনো বটতলায় পাঁচ মাথা এক হতো। কিন্তু বহুকাল সেসব এখন বন্ধ। তাই অগত্যা শ্রীপতিবাবুর বাড়ির বৈঠকখানাই তাদের জন্য মনোনীত হল। তা ছাড়া পরপর এরম ঘটনায় সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে তাই ঘরে একা থাকার চেয়ে সবাই একসাথে থাকলেই বিপদ কম মনে করেই এই সিদ্ধান্ত। তা ছাড়া এই নিয়ে আলোচনারও প্রয়োজন, এরকম তো আর চলতে দেওয়া যায় না।

গামলা থেকে একদলা মুড়ি তুলে নিয়ে মুখে পুরে প্রথম কথা শুরু করল মহেন।

"ছোটোবেলায় মা-ঠাকুমাদের মুখে কত প্রেত পিশাচের গল্প শুনেছি। তখন সব হেসে উড়িয়ে দিতাম, ভাবতাম সব গল্পকথা। তখন কি আর বুঝেছিলাম? একদিন সেই গল্পই বাস্তবে ঘটবে!"

"শোনো ভায়া বাস্তবে কোনো ঘটনা যদি নাই ঘটে তবে গল্পই বা সৃষ্টি হল কোথা থেকে?" মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে ওঠে হারান, "আমাদের মা-ঠাকুমারা তো আর এমনি এমনি গল্প বলত না, নিশ্চয়ই সেরকম ঘটনা ঘটেছিল বলেই তারা বলতে পারত আর এখন তো নিজের চোখের সামনেই প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছ যে প্রেত পিশাচ শুধু গল্পই নয় বাস্তবও বটে!"

"হুম সবই তো বুঝলাম কিন্তু আমি যা জানি, এই প্রেত পিশাচ তো আর নিজে থেকে আসতে পারে না যতক্ষণ না তাকে আহ্বান করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কাজটা করল কে? আমাদের গ্রামে তো কেউ তন্ত্রমন্ত্র জানে বলে তো আমার মনে হয় না!" চিন্তামগ্ন মুখে কথাগুলো বলে ওঠেন শ্রীপতিবাবু।

“একজন কিন্তু ছিল যে তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারে জানত!” নগেনের কথায় বৈঠকখানায় উপস্থিত সবাই চমকে ওঠে। শ্রীপতিবাবুর ভ্রূ জোড়া কিছুটা কুঞ্চিত হয়। হারান নগেনের কথা শুনে বলে, “তুই কার কথা বলতে চাইছিস বল তো? বীরেনের ভাই?”

নগেন ধীরে ধীরে ওপর নীচে মাথা দোলায়।

“কিন্তু সে গ্রাম ছেড়ে গেছে তা আজ প্রায় ১৫-১৬ বছর হতে চলল! এত বছর পর সে এইসব করতে যাবে কেন? চাইলে তো সে অনেক আগেই করতে পারত। না না আমার মনে হয় না এটা ঠিক!” শ্রীপতিবাবুর কথায় হারান, মহেন দুজনেই সায় দেয়।

“আহা তোমরা বুঝতে পারছ না! মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা বেড়ে গেলে মানুষ হেন কোনো কাজ নেই যে করতে পারে না, তা ছাড়া ও যখন গ্রাম ছেড়ে যায় তখন ও নিতান্তই ছোটো। হতেই তো পারে এতগুলো বছর সাধনা করে নিজের শক্তি বাড়িয়ে এইসব কাণ্ডকারখানা করছে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য!”

নগেনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে এবারে শ্রীপতিবাবু কিছু বলতেই যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই প্রকাশ বলল, “প্রতিশোধ! কীসের প্রতিশোধ? মনে করে দেখো নগেনদা বীরেনের ভাই কিন্তু নিজের ইচ্ছাতেই বাড়ি, গ্রাম সব ত্যাগ করেছিল। ওকে কোনোরকম কোনো জোড় করা হয়নি। ও নিজের ইচ্ছাতেই চলে গিয়েছিল কারণ বীরেন ওর ওই সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে মেলামেশা, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে মেতে থাকা পছন্দ করত না। তাই সে গ্রাম ছেড়েছিল!”

“ঠিক তাই, আমিও এটাই বলতে যাচ্ছিলাম। নাহ নাহ আমার মনে হচ্ছে না এইসবের পেছনে বীরেনের ভাইয়ের কোনো হাত আছে। বরং আমার তো মনে হচ্ছে...”

“আমারও তাই মনে হচ্ছে!”

শ্রীপতিবাবুর কথার মাঝেই আবার বলে ওঠে প্রকাশ।

বাদবাকিরা কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

শ্রীপতিবাবু প্রকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। প্রকাশ বলে, “এইসমস্ত ঘটনা কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকেই ঘটছে যেদিন ওই ঠাকুরমশাই গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। মনে করে দেখ। যেইদিন সকালে আমরা ঠাকুরমশাইয়ের ঝুলন্ত দেহ পাই তার দুদিন পর রাতেই প্রথম ভবাপাগলার মৃত্যু হয়!”

“তার মানে তুমি কী বলতে চাইছ? ঠাকুরমশাইয়ের আত্মাই কি তবে ফিরে এল তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে?” কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্নগুলো করে মহেন। প্রকাশ একটা ছোটো

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "হতেই পারে ওঁর আত্মা কোনো দোষ পেয়ে ভয়ানক পিশাচে পরিণত হয়েছে। আমি ছোটোবেলায় মামার বাড়িতে এক ঠাকুরমশাইয়ের কাছে এরকম শুনেছিলাম। কোনো নির্দিষ্ট তিথিতে অপঘাতে মারা গেলে সেই মৃতদেহের আত্মা নাকি দোষ পায়, তখন জন্ম হয় বিদেহী পিশাচের!" প্রকাশের কথায় নগেন বাদে সক্কলেই একটু চমকে ওঠে। শুধু নগেন বলে, "আরে থামো তো ভাই! যত্তসব গালগল্প! ওই কালীতলার ঠাকুরমশাই একটা ভণ্ড লোক ছিল। উনি যদি ওই পাপ কাজ না করতেন তবে কি কেউ তাকে কিছু বলতে পারত? হুহ নিজে যত ভুলভাল কাজ করবে আর কেউ কিছু বলতেও পারবে না। শোনো ভায়া তাকে যেটুকু কড়া কথা বলা উচিত ছিল সেইটুকুই বলা হয়েছিল, এখন যদি তিনি সেটা সহ্য করতে না পেরে নিজের অপমান মনে করে গলায় দড়ি দেয় তাহলে তো তাতে আমাদের কোনো দোষ নেই!" বেশ রাগত স্বরেই কথাগুলো বলে ওঠে নগেন।

"কিন্তু সেইদিন ওঁকে একটু বেশিই অপমান করা হয়ে গিয়েছিল, এতটা না হলেই বরং ভালো হতো। আমাদের আর একটু যাচাই করে দেখা উচিত ছিল!" খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে ওঠে প্রকাশ।

"মানে তুমি কী বলতে চাইছ, এই সব কিছুই আমাদের জন্য হয়েছে?" এবারে বেশ উচ্চ কণ্ঠে কথাগুলো বলে ওঠে নগেন।

শ্রীপতিবাবু পরিস্থিতি গম্ভীর বুঝে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বলেন, "আহা যা হয়ে গেছে তা তো আর আমরা বদলাতে পারব না। বরং এখন যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে তার একটা সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। এই মহেন তুমি বলছিলে না তোমার কোন চেনা এক গুনিন না কে আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তারক গুনিন। পাশের গ্রামেই থাকে। শুনেছি ওঁর নাকি বেশ নাম। আমার মনে হয় উনিই এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন!"

"বেশ বেশ তবে তুমি কালই একবার ওঁর কাছে যাও, দরকার পড়লে আমাকেও ডেকে নেবে। একসাথেই যাব না হয়। গিয়ে কথা বলে ওঁকে কালই এই গ্রামে আনার ব্যবস্থা করতে হবে!"

ওদের আলোচনার মাঝখানেই রামু এসে বলে যায় রাতের খাবার তৈরি। কথায় কথায় যে কখন রাত নেমে গেছে তা কেউ টেরই পায়নি।

"চলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে চলো, রাতে বেশিক্ষণ জেগে থাকার দরকার নেই। না জানি কখন সেই সর্বনেশে পিশাচ এসে হাজির হয়! কাল ভোরের আলো ফুটলেই

পাশের গ্রামে রওনা দিতে হবে", শ্রীপতিবাবু মহেন, নগেন, হারান আর প্রকাশকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলে ওঠে।

প্রকাশ বাদে শ্রীপতিবাবুর কথায় সায় দিয়ে সবাই উঠে দাঁড়ায়। প্রকাশ সবাইকে খেয়ে নিতে বলে, সে আর শ্রীপতিবাবু একসাথে বসবে খেতে। তার কথা শুনে হারান, নগেন আর মহেন খেতে চলে যায়।

বৈঠকখানায় এখন চুপচাপ বসে আছে শ্রীপতি আর প্রকাশ। হ্যারিকেনের হলদেটে আলোয় দেওয়ালে তাদের ছায়া দুটো তিরতির করে কাঁপছে। গ্রামে বিদ্যুৎ এলেও বেশিরভাগ সময়ই এখানে কারেন্ট থাকে না। তাই হ্যারিকেনই একমাত্র ভরসা।

শ্রীপতিবাবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে কিছু নিয়ে একটা চিন্তা করছিলেন। কী মনে হতেই তিনি হঠাৎ মাথা তুলে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেলেন। প্রকাশ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কী যেন ছিল সেই দৃষ্টিতে, দেখেই শ্রীপতিবাবু চমকে উঠলেন। হ্যারিকেনের আলো আগের থেকে অনেকটাই কমে এসেছিল, আর তার মধ্যে প্রকাশ যেদিকটা বসে ছিল সেদিকটায় আলো কিছুটা কমই পড়েছিল। তাই আলো আঁধারির একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেখানটায়। সেই আলো আঁধারিতেই প্রকাশের চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছিল। যে-কোনো মানুষই হঠাৎ করে ওরকম দেখলে চমকে উঠতে বাধ্য।

এবারে বেশ একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল শ্রীপতিবাবুর। প্রকাশের দৃষ্টি যেন শ্রীপতিবাবুকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে চাইছে। যেন খুব সন্তর্পণে মনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সমস্ত কথাগুলো এক এক করে পড়ে নিচ্ছে সে। এত অস্বাভাবিক কেন ঠেকছে তার? তবে প্রকাশ কি কিছু আন্দাজ করল?

"কী হল শ্রীপতিদা? কী ভাবছেন এত?" প্রকাশের গম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠলেন শ্রীপতি।

"কই... কী... ক... কী নি...য়ে আর ভাব...ভাবব, কিছুই না!" শ্রীপতিবাবুর কথাগুলো আটকে আটকে যায়। হঠাৎই তার প্রকাশকে ভয় লাগতে শুরু করেছে, সে কি কিছু জানে তার কুকীর্তির কথা? "সর্বনাশ! যদি সে সব কিছু ফাঁস করে দেয়। না না আগে তাকে বুঝতে হবে প্রকাশ কতটা জানে! হয়তো কিছুই জানে না। শুধু শুধুই..." গোপনে কথাগুলো মনে মনে একবার ভেবে নেয় শ্রীপতি। তাকে ওইভাবে ভাবলেশহীন মুখে বসে থাকতে দেখে প্রকাশের মুখে একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে যায়। ঘরের উত্তর দিকের জানলা দিয়ে একটা বেশ মন ভালো করা শীতল হাওয়া ভেসে আসছিল অনেকক্ষণ ধরেই। তাই এই লোডশেডিং

হলেও হাতপাখার দরকার পড়ছিল না। প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর হাওয়ায় ঘরের ভেতর একটা ঠান্ডা আমেজ এমনিই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ করেই শ্রীপতির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা ফুটে ওঠে। কী বলবে সে বুঝতে পায় না, ক্রমশই ঢোক গিলতে থাকে। শ্রীপতির এই অবস্থা দেখে প্রকাশের মুখের হাসি আরও কিছুটা চওড়া হয়।

"ঠাকুরমশাই গলায় দড়ি দেওয়ার পর রাতারাতি কেমন পাঞ্চালীও উধাও হয়ে গেল। খুঁজেই পাওয়া গেল না তাকে, তাই না শ্রীপতিদা?" শ্রীপতির দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে কথাগুলো বলে ওঠে প্রকাশ।

প্রকাশের মুখে পাঞ্চালীর নামটা শুনেই শ্রীপতির বুকটা ধড়াস করে ওঠে। "যা আন্দাজ করেছিলাম ঠিক তাই, প্রকাশ কিছু একটা জানে! কিন্তু কী করে, তবে কি সেইদিন রাতে সে কি কিছু দেখেছিল? না না সে কী করে সম্ভব!" মনে মনে কথাগুলো ভাবে শ্রীপতি। কিন্তু প্রকাশের সম্মুখে এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত না হয়ে তিনি বলেন, "সে কোথায় গেছে তা আমি কী করে জানব? দেখো গিয়ে সেও কোথাও গিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে কিনা? স্বামীর মৃত্যু শোক হয়তো তার সহ্য হয়নি। কিংবা দেখো গিয়ে কারোর সাথে পালিয়েও যেতে পারে, যার স্বামী অমন অপকর্ম করতে পারে তার স্ত্রীর চরিত্র আদৌ ঠিক কিনা তা নিয়ে আমার বেশ সন্দেহ আছে!" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যায় শ্রীপতি। প্রকাশকে দেখে মনে হয় সেও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে, হয়তো এত তাড়াতাড়ি এত স্পষ্ট জবাব সে আশা করেনি শ্রীপতিবাবুর থেকে। প্রকাশ হয়তো আরও কিছু বলতে যেত কিন্তু তার আগেই ঘরে রামু এসে জানিয়ে যায় যে সবার খাওয়া শেষ এবারে শ্রীপতি আর প্রকাশ খেয়ে নিলেই হয়ে যাবে। শ্রীপতি যেন মনে মনে এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিলেন, কী করে প্রকাশকে এড়ানো যায়। সে সুযোগ রামু এনে দেওয়াতেই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, "রামু তুমি যাও, প্রকাশ আর তুমি একসাথে খেয়ে নাও। আজ আমি আর কিছু খাব না, শরীরটা ভালো লাগছে না!"

রামু তার মালিকের কথা শুনে ছুটে আসার আগেই শ্রীপতি হাত তুলে তাকে সান্ত্বনা দেয় যে সে ঠিক আছে, তার এত উতলা হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর প্রকাশের দিকে ফিরে তাকে একটা লম্বা চওড়া হাসি দিয়ে, খেয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে শ্রীপতি নিজের ঘরের দিকে রওনা দেয়। বলা ভালো পালিয়ে যায়। সে চলে গেলে পরে রামু প্রকাশকে তাড়াতাড়ি এসে খেয়ে নেওয়ার অনুরোধ করে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। ফাঁকা ঘরে হ্যারিকেনের হালকা আলোয় একলা বসে প্রকাশ রাগে ফুঁসতে থাকে। সে খুব ভালো মতোই জানে যে শ্রীপতি কী অপকর্মটাই না করেছেন! শুধুমাত্র প্রমাণের অভাবে সে কিছু বলতে বা

করতে পারছে না। শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে আসার কারণই তার এই গোপন রহস্যটা জানা, নাহলে এই নিকৃষ্ট মনের মানুষের বাড়িতে আসার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। সে চটপট উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে লক্ষও করে না যে ঘরের বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে খুব সন্তর্পণে কেউ তার সমস্ত ভাবভঙ্গি লক্ষ করছিল। প্রকাশ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই সেই অবয়বও ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

// ৬ //

এখানে শ্রীপতিবাবুর পরিচয়টা দিয়ে রাখি।

এই বাউডিহি এখন একটি ছোটো গ্রাম হলেও বহু বছর আগে বাউডিহি, তার পাশের চন্দডিহি, চাঁদডুবি এবং আরও তিন-চারটে ছোটো ছোটো গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন ভূপতি রায় চৌধুরী। তখন এই গ্রামগুলো মিলে একটা বড়ো এলাকা ছিল।

ভূপতির তিন ছেলে ছিল। ছোটো ছেলে ৭ বছর বয়সে কোনো এক অজানা রোগে ভুগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। দুবছর পর সে মারা যায়। ভূপতি তার ছেলে বিয়োগের শোক সামলাতে পারেননি কোনোদিন। তিনিও ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সমস্ত দায়িত্ব ও জমি-জায়গা ভাগ করে যান তার বড়ো ছেলে ও মেজ ছেলেকে।

কৃষ্ণপতি রায় চৌধুরী হলেন তার মেজ ছেলে। তার ভাগেই পড়েছিল এই বাউডিহি, চন্দডিহি ও চাঁদডুবি গ্রাম। এই কৃষ্ণপতির ছিল দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। মেয়ের নাম সীমন্তি, বড়ো ছেলে নৃপতি আর ছোটো ছেলে হলেন এই শ্রীপতি। ছোটো থেকেই ভীষণ অবাধ্য ছিলেন শ্রীপতি। নিজে যা ঠিক মনে করতেন তাই করতেন। খুবই বেপরোয়া যাকে বলে। অন্যদিকে নৃপতি আর সীমন্তি ছিল বাবা-মায়ের একদম বাধ্য সন্তান। পড়াশোনাতে নৃপতি ছিলেন অসামান্য। সীমন্তিও বাবার মতো দায়িত্বশীল আর মায়ের মমতাময়ী গুণ পেয়েছিল। খুব বড়ো এবং ভালো ঘরে তার বিয়েও হয়ে যায়। নৃপতিও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বাবার জমিদারির ভার নেয়। এই রায়চৌধুরী বংশ তাদের দান ধ্যানের জন্য আশেপাশের গ্রামে খুবই পরিচিত।

কৃষ্ণপতিকে গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ ভগবানের চোখে দেখত। নৃপতিও বাবার গুণ পাওয়ায় গ্রামের প্রত্যেকটা লোক তাকে যেমনি শ্রদ্ধা করে তেমনি খুব ভালোও বাসে। কোনোরকম অহং বোধ তার মধ্যে এতটুকু নেই। তিনি গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ান। কোনোরকমের অত্যাচার তো দূরে থাক, গ্রামের কোনো মানুষ কোনোরকম বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তার বিপদ নিরাময় করতেন। তাদের সময় কোনো মেয়ে বউয়ের সম্মানহানিও হয়নি। তাদের কোনোরকম বদ নেশা ছিল না। সারাদিন শুধু কাজ নিয়ে থাকতেই তারা ভালোবাসতেন।

কিন্তু এর সম্পূর্ণ উলটো প্রকৃতির মানুষ হল এই শ্রীপতি। জমিদারিতে তার কোনোদিনই

খুব একটা নজর ছিল না। তিনি মেতে থাকতেন জুয়া, মদ, গাজায়। খুব কম বয়সেই তিনি নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম প্রথম অনেক বারণ করা হয় তাকে কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। নৃপতি তার ছোটো ভাইকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে তার ভাই সুস্থ পথে ফিরে আসুক। নৃপতি এও বলে যে শ্রীপতি যদি ঠিক পথে ফিরে এসে জমিদারির ভার নেয় তাহলে সে তার ভূস্বত্বের অধিকাংশটাই তার নামে লিখে দেবেন। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। শ্রীপতির কোনোদিনই সম্পত্তির প্রতি লোভ ছিল না। তার শুধু একটাই দোষ এই নেশার আসক্তি।

পরবর্তীকালে পরিবর্তন তো দূরে থাক একটা সময় তিনি লুকিয়ে আনন্দ ফূর্তি করার জন্য নটীবাড়ি যাওয়াও শুরু করেন। কিন্তু খুব বেশিদিন তার কপালে এই সুখ সইল না। নৃপতি বাবুর কাছে শ্রীপতির লুকিয়ে লুকিয়ে নটীবাড়ি যাওয়ার খবর চলে আসে। আর তারপরেই তার ক্রোধের বাঁধ ভাঙে। তিনি নৃপতিকে মহল থেকে বার করে দেন। তার মন না চাইলেও শ্রীপতিকে শিক্ষা দিতে তাকে এটা করতেই হয়। কিন্তু ভেতর ভেতর তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। তার স্ত্রী সমস্তটা বুঝতে পেরে স্বামীকে বোঝান। তার পরামর্শতেই পাশের গ্রাম বাউডিহিতে শ্রীপতির জন্য একটা একতলা বাড়ি তৈরি করা হয়। তাকে বলে দেওয়া হয় যে রাজবাড়ির সাথে আর কোনোরকমের সম্পর্ক তার থাকবে না। সে গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের মতোই সাধারণের মতো জীবনযাপন করবে, খেটে খাবে। কোনোরকম সাহায্য রাজবাড়ি থেকে দেওয়া হবে না। সেইদিন থেকেই নৃপতি আর শ্রীপতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যান। শ্রীপতি নিজের ভুল মনে মনে অনুভব করলেও বাইরে তা প্রকাশ করেন না। তিনি চুপচাপ রাজবাড়ি ছেড়ে বাউডিহিতে এসে বসবাস শুরু করেন। সাধারণের মতোই জীবনযাপন করতে থাকেন। সেই ঘটনার পর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। এখন নৃপতির বড়ো ছেলে রমাপতি সমস্ত দায়িত্ব তার কাঁধে তুলে নিয়েছে। নৃপতিও তার সমস্ত দায়িত্ব বড়ো ছেলেকে দিয়ে নিশ্চিন্তে তার স্ত্রীর সাথে বার্ধক্যকাল অতিবাহিত করছেন। ছোটো ছেলে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় থাকে। দু-তিন মাসে একবার সে এই গ্রামে আসে। আর এক ছেলে ছোটো অবস্থাতেই কোনো এক অজানা জ্বরে ভুগে মারা গিয়েছিল।

এতটা সময় কেটে গেলেও নৃপতি বা শ্রীপতির মধ্যে কিন্তু আজও সেই অভিমানের পরিমাণ এতটুকুও কমেনি। বরং সময়ের সাথে তা বেড়েই গেছে। গ্রামের মানুষের কাছেও শ্রীপতি একজন সাধারণ মানুষের মতোই হয়ে গেছে। তার গায়েও যে রাজবাড়ির রক্ত বইছে তা একপ্রকার সকলে ভুলেই গেছে। তবে গ্রামের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে

গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ খুব অদ্ভুতভাবে শ্রীপতিবাবুর ওপরই নির্ভর করে।

শ্রীপতি সবার সাথে মেশেন না। তার বন্ধু সংখ্যা ওই ৫-৬ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের বলতে হারান, নগেন, মহেন আর প্রকাশ এই চারজনই মাত্র। যাই হোক এবারে গল্পে আসা যাক।

রাত্রি ৯টার মধ্যেই সকলে খেয়ে যে যার বরাদ্দ ঘরে চলে গেল ঘুমানোর জন্য। পরেরদিন ভোরের আলো ফুটলেই পাশের গ্রামে যেতে হবে তারক গুনিনের কাছে। তা ছাড়া রাত্রি গভীর হওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়াই শ্রেয়, এই মনে করেই সকলে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু চোখ বুজে থাকলেও সকলের মনে মনে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনায়মান। না জানি আজ আবার কার প্রাণ যায়। হারান, নগেন এক ঘরে একসাথে আর মহেন, প্রকাশ আর এক ঘরে একসাথে শুয়েছে। রামু আজ বৈঠকখানাতেই নিজের বিছানা বানিয়ে নিয়েছে।

প্রায় অনেকটা সময় কেটে গেছে মহেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে তার তীব্র নাসিকাগর্জন সেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্নতার জানান দিচ্ছে। কিন্তু প্রকাশের চোখে কোনো ঘুম নেই। কী যেন একটা তাকে তীব্র দংশনে বিদ্ধ করে যাচ্ছে ক্রমাগত। সেই প্রথম দিন থেকেই তার মন বলছে ঠাকুরমশাই এরকম ঘৃণ্য কাজ করতেই পারেন না। তিনি খুবই পবিত্র মনের একটা মানুষ ছিলেন। আর কেউ না জানুক প্রকাশ জানে এবং মনে মনে তাকে বিশ্বাসও করে। কিন্তু তাহলে সেদিন, যেদিন সকলে তার বিরুদ্ধে কথা বলছিল, অপমানে লাঞ্ছনায় জর্জরিত করে দিচ্ছিল, পাঞ্চালী সমানে এসে তার কাছে কাকুতিমিনতি করছিল তার স্বামীকে বাঁচানোর জন্য, কই সেইদিন তো প্রকাশ কিছু বলতে পারল না। কোনো প্রতিবাদ করল না। আর পাঁচ জনের মতো তো সেও সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমশাইয়ের অপমানই সহ্য করেছিল। ঠাকুরমশাইয়ের আত্মহত্যার পর পাঞ্চালীর সেই তীব্র ক্রোধান্বিত চক্ষু দেখে শিউরে উঠেছিল প্রকাশের অন্তরাত্মা। সেই চোখ আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে প্রকাশকে। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে ওঠে সেই মুখাবয়ব, সেই চোখ!

প্রকাশ এবারে শুয়ে থাকতে না পেরে উঠে পড়ে। তার ভীষণ অস্বস্তি হতে শুরু করেছে। এত ঘাম হচ্ছে কেন? আর নিঃশ্বাস নিতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আসা চাঁদের নামমাত্র আলোয় হাতড়ে হাতড়ে কলসি থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে সে। কিন্তু তাতেও তার অস্বস্তি কমতে চায় না। এবারে হঠাৎই তার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। এই ঘন নিঃশব্দতার মাঝে তার হৃৎপিণ্ডের তীব্র ধুকপুকানির আওয়াজ যেন কানে খুব বাজতে শুরু করেছে। সর্বনাশ

তবে কি রামু তার খাবারে কিছু মিশিয়ে দিল? প্রকাশ এবারে গলগল করে ঘামতে শুরু করে। নাহ এক্ষুনি একবার বাইরে গিয়ে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে না পারলে সে এখানেই দমবন্ধ হয়ে মারা পড়বে। প্রকাশ হন্তদন্ত হয়ে বাইরের দরজার দিকে ছুটে যায়। এতকিছুর মধ্যে তার বাউডিহিতে ঘটে চলা নৃশংস হত্যালীলার কথা মাথাতেই থাকে না। এইদিকে প্রকাশকে বাইরের দরজার দিকে ছুটে যেতে দেখে অন্ধকারে মিশে থাকা একটা আবছা অবয়বও তার পিছু নেয়। প্রকাশ প্রধান দরজার কাছে এসে দরজাটা খুলতেই যায় কিন্তু তার আগেই সে বুঝতে পারে যে বাড়ির সদর দরজা খোলা। সে বুঝতে পারে ইচ্ছে করেই পুরো পরিকল্পনামাফিক এইসব করা হচ্ছে। এর মানে তার অনুমানই সঠিক। পাঞ্চালীর উধাও হয়ে যাওয়ার পিছনে এদেরই হাত আছে। শ্রীপতির সাথে হয়তো রামুও সমস্ত কিছু জানে। ওরা নির্ঘাত প্রকাশের খাবারে কিছু মিশিয়ে দিয়েছে আর ইচ্ছে করেই সদর দরজা খুলে রেখেছে যাতে রাতে শ্বাস নিতে না পেরে আমি বাইরে চলে যাই আর বাইরে যাওয়া মানেই তো সেই... আর কিছু ভাবতে পারে না প্রকাশ, তার আগেই কেউ পিছন থেকে এক ধাক্কা মেরে তাকে বাইরে ফেলে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় টাল সামলাতে না পেরে ওখানেই মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে। তার মাঝেই দুটো শব্দ তার কানে আসে। একটা দরজায় হুড়কো লাগানোর শব্দ আর বহু দূর থেকে আগত একটা শিসের মতো শব্দ। যে শব্দের আগমনে বাউডিহির প্রত্যেকটা মানুষ কেঁপে ওঠে। প্রকাশ ধীরে ধীরে চোখ বোজে। তার উঠে দাঁড়ানোর কোনো ক্ষমতা থাকে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল বেরিয়ে এসে মাটির খানিকটা অংশ ভিজিয়ে দেয়। আর একটা নৃশংস মৃত্যুর কথা কাল সকলের মুখে মুখে ঘুরবে। হয়তো রমা আর প্রকাশের মা ছুটে এসে তার ছেলের বীভৎস মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়বে। সবাই মিলে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করবে। তার কিছুদিন পর সবাই সব ভুলে গিয়ে অসহায়ের মতো অপেক্ষা করবে সেই বিভীষিকার। নতুন কোনো মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকেদের হাহাকারে মিলিয়ে যাবে প্রকাশের স্ত্রী আর মায়ের কান্না। সবাই হয়তো প্রাণের তাগিদে এই গ্রাম ছাড়বে একে একে। শুধু বাউডিহি শ্মশানে পড়ে থাকবে প্রকাশ আর তার সাথে মারা যাওয়া মানুষের পোড়া ছাই। বাউডিহির বাতাসে ঘুরে বেড়াবে মৃতদের আর্ত কান্না। শুধু কেউ এটা জানবে না কত বড়ো অন্যায় ঘটে গেছে এই গ্রামেরই মাটিতে। যাকে সবাই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে সেই এই কর্মের জন্য দায়ী। কেউ জানবে না পাঞ্চালীর সাথে কী হয়েছিল। কেউ জানবে না!

সব কিছু অন্ধকার হওয়ার আগে প্রকাশ মনে মনে ঈশ্বরকে একবার স্মরণ করে, হয়তো

শেষ ইচ্ছা ভগবানকে জানায়, হয়তো পাঞ্চালীর প্রতি হওয়া অন্যায়ের ন্যায় বিচার চায়। হঠাৎ প্রকাশ তার গলা আর মাথার কাছে এক তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। একটা তীব্র আর্তনাদ আর তারপর সব অন্ধকার, সব নিশ্চুপ। পুনরায় বাউডিহি নির্জনতার গহন অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

// ৭ //

সকালে লোকেদের কোলাহলে ঘুম ভাঙে রামুর। প্রথমটায় কিছু বুঝে উঠতে পারে না সে। তারপর হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে থেকে নিজের আর শ্রীপতির নাম শুনতে পেয়েই এক ছুটে সদর দরজার কাছে চলে আসে সে। বাড়ির বাইরে তখনও লোকেরা চিৎকার করে বাড়ির ভেতরের সদস্যকে ডেকে যাচ্ছে। প্রথমে দরজা খুলে সামনের দিকে জিজ্ঞাস্য চোখে তাকায় সে। তারপর ভীড়ের লক্ষ্য অনুসরণ করে সেইদিকে তাকাতেই এক তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে রামু। বাড়ির উঠোনের একেবারে পশ্চিমদিকের কোণে পড়ে আছে একটা ক্ষতবিক্ষত লাশ। মাথা দেহ থেকে ছিন্ন। সারা দেহের মাংস খুবলে খুবলে খাওয়া। পোশাক দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না রামুর। এই লাশ প্রকাশের। এতদিন শুধু সে এই মৃত্যুর কথা শুনে এসেছে। কিন্তু দেখতে যাওয়ার সাহস তার হয়নি। কিন্তু আজ এইরকম বীভৎসতা নিজের চোখের সামনে দেখে ওখানেই মূর্ছা যায় সে। বাইরের কোলাহল আরও বেড়ে যায়। এইবারে একে একে শ্রীপতি, নগেন, হারান, মহেন সক্কলে বেরিয়ে আসে। বাইরের ওই দৃশ্য দেখে সবার চোখ কপালে উঠে যায়। শুধু একজন খুব একটা অবাক হয় না।

প্রকাশের মা তার ছেলের এই অবস্থা দেখে উন্মাদের মতো ছুটে এসে সেই ছিন্ন ভিন্ন দেহের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। প্রকাশের স্ত্রীও জ্ঞান হারিয়ে ওখানেই পড়ে যায়।

একের পর এক এরকম ভয়ানক আর আজব ঘটনা ঘটতে থাকায় এবারে ঘটনাগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে আশেপাশের অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে কেউ আর বাউডিহি গ্রামে আসা তো দূর, গ্রামের সীমানার ধারে কাছে ঘেঁষে না। ইতিমধ্যে দুদিন কেটে গেছে। এখনও কারোর মৃত্যুর কথা আর শোনা যায়নি। সবাই দমবন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী ভয়াবহ কিছু ঘটার। প্রকাশের ঘটনায় সবাই এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে দুদিন কেউ গ্রামের বাইরে যাওয়ার সাহসটুকু পায়নি। কিন্তু তিন দিনের দিন হারানেরা ঠিক করল এবারে ওই তারক গুনিনের কাছে যাবেই। এই তল্লাটে কিংবা আশেপাশের তল্লাটে উনি ছাড়া এমন আর কেউ নেই যে এই বিপদ থেকে বাউডিহিকে বাঁচাতে পারে। পরের দিন ভোর হতেই সকলে একত্রে রওনা দিল পাশের গ্রাম চন্দডিহির উদ্দেশ্যে।

****

“কী রে! একমনে কী এত চিন্তা করছিস?” ভাবনার মাঝে এতটাই ডুবে ছিল নীল যে কখন তীর্থ এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি। নীলের ভাবনার জাল ছিন্ন হয় তীর্থের হঠাৎ এসে পিঠে চাপড় মারার কারণে।

“উফ! এই তুই কি হাত না চালিয়ে কথা বলতে পারিস না?” মুখ বিকৃত করে কথাগুলো তীর্থের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে নীল।

“এই সরি বস, একটু জোরে হয়ে গেল”, বলেই জিভ কাটে তীর্থ।

পাশের ঘর থেকে রানু মাসি বেশ একটু চিল্লিয়ে বলে ওঠে, “তা কী করবে দাদাবাবু? তোমাকে কখন থেকে বাইরের ঘর থেকে ডেকে গেলাম তুমি তো নিজের জগতেই হারিয়ে আছো! সাড়াই দিলে না, তাই তো তীর্থ দাদাবাবুকে তোমার ঘরে পাঠালাম, চাপর মেরে তোমার ঘুম ভাঙাতে”, বলেই ফিক করে হেসে ফেলে রানু মাসি। সেই দেখে নীল আরও চোটে যায়। তীর্থ এবারে রানু মাসিকে গরম গরম কফি বানিয়ে আনতে বলে নীলের মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসতে বসতে বলে, “কী ভাবছিস বল তো এত, কোনো গুরুতর সমস্যা নাকি?” নীল চেয়ারে আরও একটু শরীরটা এলিয়ে দেয়, “গুরুতর কিনা জানি না কিন্তু খুবই অদ্ভুত ব্যাপারটা!”

নীলের মুখে বিস্তৃত চিন্তার ছাপ নজর এড়ায় না তীর্থের। সে আবার জিজ্ঞেস করে, “হ্যাঁ রে তোর গ্রামে কারোর কিছু হল নাকি? আর তা ছাড়া তুই গ্রামে গেলি না এবারে? কী যেন নাম... বা... হ্যাঁ বাউডিহি। পরীক্ষা তো সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে!”

গ্রামের কথা শুনতেই নীলের ভ্রূ জোড়া আরও কিছুটা সংকুচিত হল।

নীল বলে উঠল, “বাউডিহি নয় চাঁদডুবি আমার গ্রাম। তবে আমার গ্রামে যেতে হলে এই বাউডিহি দিয়েই যেতে হয়!”

রানু মাসি কফি দিয়ে গেলে নীল তীর্থকে তার পাশের গ্রামে মানে বাউডিহিতে ঘটে চলা সমস্ত অলৌকিক ঘটনাগুলো একে একে বলতে শুরু করে। ঘটনাগুলো খুব মন দিয়ে শুনতে থাকে তীর্থ।

তীর্থ আর নীল খুবই ভালো বন্ধু। নীল গ্রামের ছেলে হলেও তীর্থ কখনওই ভেদাভেদ করেনি নিজেদের মধ্যে। ওদের বন্ধুত্ব, আলাপ পরিচয় সেই কলেজ লাইফ থেকে। এখন দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করছে। তীর্থ প্রত্যেকবারই দেখেছে সেমিস্টার শেষ হলেই নীল অন্তত দুদিনের জন্য হলেও তার দেশের বাড়ি মানে চাঁদডুবি গ্রামে যায়। ও

বলে ওর গ্রাম নাকি ওর কাছে অক্সিজেনের মতো। তাই পরীক্ষার পর একবার সেখানে যেতে না পারলে ও পড়ায় কিছুতেই মন বসাতে পারবে না। কিন্তু এবারে সেই নীলই যখন পরীক্ষার এতগুলো দিন পরেও ওখানে যায়নি তখন নিশ্চয়ই শারীরিক কোনো গণ্ডগোল হয়েছে এই ভেবে খোঁজ নিতে নীলের ভাড়া বাড়িতে চলে আসে তীর্থ। কিন্তু এসে নীলকে ওরকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে তীর্থ বুঝতে পারে নিশ্চয়ই গ্রামে কোনো সমস্যা হয়েছে। কিন্তু এখন নীলের মুখ দিয়ে সমস্ত ঘটনা শুনে তীর্থ আর নিজের হাসি চেপে রাখতে পারল না। হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

"উফ বাবা, এই ব্যাপার, ওফ... হ্যাঁ রে তুই এইসবে বিশ্বাস করিস হ্যাঁ? কীসব ভূত প্রেত পিশাচ! ওরে এই বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়েও এইসব গাঁজাখুরি গল্পতে যে তোর এত বিশ্বাস তা আমি আশা করিনি! শোন ওইসব কিছুই নয়, দেখ গিয়ে সব গ্রামের মানুষদের রটানো গল্পকথা! কাকিমাকে বল এত চিন্তা না করতে।"

নীল এবারে তীর্থের কথায় একটু বিরক্তই হয়। "তীর্থ তুই মানিস আর নাই মানিস। এই যুগে দাঁড়িয়ে এখনও এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যার কার্যকরণ যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করা যায় না। সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনায় বা বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়েও সেইসব অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলোর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কলকাতার আলো ঝলমলে পরিবেশে বসে বাউডিহির গা ছমছমে পরিবেশ তুই কল্পনাও করতে পারছিস না!" একটানা কথাগুলো বলে যায় নীল।

"আরে আরে ঠিক আছে এত চটে যাচ্ছিস কেন?"

"দেখ এই খবরটা", বলেই নীল তীর্থের দিকে পেপারটা এগিয়ে দেয় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অঙ্গুলিনির্দেশ করে। তীর্থ পেপারটা নিয়ে সেখানে কী লেখা আছে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখগুলো যেন একবার জ্বলজ্বল করে ওঠে।

"এ তো তোর এই গ্রামেরই..."

"যার কথা ওখানে লিখেছে সেটা প্রকাশ কাকু। গত পরশুদিন রাতেই উনি মারা যান!" বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীল।

"তুই চিনতিস ওঁকে?" তীর্থ জিজ্ঞেস করে।

"হুম!" উত্তর দেয় নীল।

"আচ্ছা তুই সেই বলছিলি না, বাউডিহিতে তোদের কে থাকে?"

নীল এবার একটু অবাক হয়, "হ্যাঁ বীরেনদা। মানে ওঁর মা শান্তা মাসি আমাদের বাড়িতে কাজ করত, বীরেনদা তখন ছোটো ছিল বলে মাসি বীরেনদাকেও নিয়ে আসত আমাদের

বাড়ি। সেই থেকেই আলাপ। আমরা ছোটোবেলায় একসাথে খেলতামও। কিন্তু কেন বল তো?"

তীর্থের চোখ যেন চকচক করে ওঠে।

"শোন তুই ব্যাগপত্র গোছাতে শুরু কর। এবারে আমিও তোর সাথে তোর গ্রামে যাব বেড়াতে!"

তীর্থের এমন কথা শুনে নীল একেবারে হকচকিয়ে যায়। "তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুই বুঝতে পারছিস না বাউডিহির কী অবস্থা এখন। আমাদের গ্রামে যেতে হলে এই বাউডিহি দিয়েই যেতে হবে! আর সেখানে তোর যদি কিছু হয়ে যায় তখন সমস্ত দায় আমার ঘাড়ে এসে চাপবে। না না আমি তোকে নিয়ে এত বড়ো রিস্ক কিছুতেই নিতে পারব না!"

নীল সমানে মানা করতে থাকে কিন্তু তীর্থ একেবারে নাছোড়বান্দা, সেও ছাড়ার পাত্র নয়। অবশেষে নীল তীর্থের জেদের কাছে হার শিকার করে। কিন্তু নীল এও বলে যে সকালের আলো থাকতে থাকতেই বাউডিহি গ্রাম পেরোতে হবে। তা না করে তীর্থ নিছক কৌতূহলের বশে যদি সে মনে করে থাকে যে সে বাউডিহির রহস্য উদঘাটন করবে তাহলে নীল কিছুতেই যাবে না। তীর্থ নীলের শর্তে রাজি হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ নিজের ব্যাগপত্র গোছানোর জন্য বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়।

"এই এই ধীরে যা, এত তাড়াহুড়ো কিসের? আমরা কি আজই বেরাব নাকি?" চিন্তিত মুখে তীর্থর দৌড়ে যাওয়া লক্ষ করে কথাগুলো বলে ওঠে নীল।

"আজ বেরাই আর পরশু! যাচ্ছি তো এটাই ফাইনাল!" তীর্থর কথা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

নীল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মন সমানে কু-ডাক ডেকে চলেছে। একটা চাপা অস্বস্তি ঘিরে ধরছে যেন তাকে। ও কি তীর্থের কথা শুনে ঠিক করল? না জানি কী ঘটতে চলেছে তাদের জীবনে? নীল তীর্থকে খুব ভালো করেই চেনে। ওর গ্রামে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য যে শুধু বেড়াতে যাওয়া নয় তা নীল ভালোই বুঝতে পেরেছে। যে করেই হোক ওকে ওর কার্যসিদ্ধি থেকে আটকাতেই হবে। তীর্থ চিরকালই শহরে বড়ো হয়ে এসেছে। গ্রামের অতিপ্রাকৃত ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই। তীর্থ এইসবে বিশ্বাস না করলেও নীল কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

নীলের সংবিৎ ফেরে রানু মাসির ডাকে। তার রান্না হয়ে গিয়েছে, এর মানে নীলকে এখন স্নানে যেতে হবে। ঘড়িতে একবার সময়টা দেখে নেয় সে। প্রায় ১টা ছুঁইছুঁই। নীল আর দেরি

না করে টাওয়ালটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যায়।

****

"না না আমার এখন সময় নেই, তোরা যা তো দেখি, আর জ্বালাস না আমায়!" জলদগম্ভীর গলায় আদেশ দেয় তারক গুনিন। তার এমন আদেশ শুনে এক লাফে তার পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ে কাচুমাচু মুখ নিয়ে নগেন বলে, "এরকম বলবেন না বাবা, এখন আপনি ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আপনিই এখন একমাত্র ভরসা আমাদের! দয়া করে আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। বড়ো আশা করে এসছি আপনার কাছে!"

নগেনকে দেখে হারান, মহেনও তারক গুনিনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে খানিকটা বিরক্ত হয়েই তারক গুনিন বলে, "আচ্ছা বেশ বেশ ওঠ দেখি এবার, আমি যাব তোদের সাথে। ছাড় ছাড় পা ছাড়!" তারক গুনিন যেতে রাজি হওয়ায় এবারে সকলের চোখেমুখে একটা উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে।

নগেন বলে ওঠে, "উফ বাবা আপনি বাঁচালেন আমাদের। জয় বাবা তারক বাবার জয়! জয় বাবা তারক বাবার জয়!"

"থাম আর জয়ধ্বনি দিতে হবে না। চল দেখি এবার, তোদের গ্রামের পানে রওনা দিই!" তারক গুনিনের কথা শেষ হতেই হারান, নগেন আর মহেনের চোখেমুখে এক ভয়ের রেখা ফুটে উঠল। তারা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। তাদের চোখমুখের পরিবর্তন তারক গুনিনের নজর এড়ায় না। সে আবার তার জলদগম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, "কী রে, এই তো এতক্ষণ আমার মাথা খাচ্ছিলি, কী হল হঠাৎ? সিদ্ধান্ত বদলালি নাকি?"

হারান একেবারে হা হা করে ওঠে, "না না বাবা এ কী বলছেন, এখন এই অবস্থায় আপনিই একমাত্র আমাদের রক্ষক!"

"তবে? তোদের এত দুশ্চিন্তা কীসের?"

"আসলে বাবা এখানে পৌঁছতেই তো দুপুর গড়িয়ে গেল। এখন আমাদের গ্রামের দিকে রওনা হলে যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে...!"

"তো? ভয় করছে? হা হা হা হা...!"

বাতাস কাঁপিয়ে গম্ভীর গলায় এক চোট হেসে নিলেন তারক গুনিন। তার হাসির দমকে নগেনরা চমকে ওঠে।

"আমি তোদের সাথে যাচ্ছি তাতেও তোদের এত ভয়? বেশ, চিন্তা করিস না। আমি তোদের প্রত্যেকের গাত্র বন্ধন করে দিচ্ছি। কোনো প্রেত পিশাচ তোদের টিকিটাও ছুঁতে

পারবে না!”

নগেনদের চোখে-মুখে পুরোনো উজ্জ্বলতা ফিরে আসে তারক গুনিনের কথায়। আবার শোনা যায়, “জয় বাবা তারক বাবার জয়! জয় বাবা তারক বাবার জয়!”

// ৮ //

“কী হল বাবা? থেমে গেলেন যে!” বিষণ্ণ মুখে তারক গুনিনের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলে ওঠে নগেন। বাউডিহি ঢোকার আগে তারক গুনিন সকলের গাত্র বন্ধন করে দিয়েছিলেন। সমস্ত রাস্তাটাই তিনি একটা বীজমন্ত্র জপ করতে করতে আসছিলেন কিন্তু বাউডিহির সীমানার কাছাকাছি আসতেই তিনি হঠাৎই থমকে গেলেন। তার মুখ দিয়ে আর কোনো মন্ত্রোচ্চারণ শোনা গেল না। বদলে তার মুখে ফুটে উঠল এক ভয়ের ছায়া।

একমনে তিনি দিগন্তের পানে চেয়ে থাকেন। নগেনের ডাকে তারক গুনিনের হুঁশ ফেরে। নগেনের প্রশ্নের উত্তরে এবারে তারক গুনিন যা বললেন তাতে সবাই একেবারে চমকে উঠল।

“এ কী করেছিস তোরা?”

“কেন বাবা কী হয়েছে?”

“তোদের গ্রামে এক মহা শয়তানের প্রকোপ পড়েছে। এ কোনো সাধারণ পিশাচ নয়! তোদের সামনে ভীষণ বিপদ!”

“কী বলছেন বাবা! আমাদের বাঁচান। এইসব কী করে হল? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!”

“সেটাই তো ভাবছি এত বড়ো বিপদ তোরা বাধালি কী করে? যাক গিয়ে, আগে আমাকে জানতে হবে যে কতটা ভয়ানক এই পিশাচ! নগেন...”

“আজ্ঞে বলুন বাবা!”

“আমাকে কয়েকটা জিনিস জোগাড় করে দিতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে?”

“ঠিক আছে বাবা!”

“বেশ চল এবার গ্রামে ঢোকা যাক।”

সকলকে নিয়ে গ্রামের ভিতরের দিকে রওনা দিলেন তারক গুনিন। সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে। গায়ে ঘেষাঘেষি করে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। ওইদিকে তারক গুনিনের মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আরও ঘন হচ্ছে।

হঠাৎ সামনের অন্ধকারের মাঝে আরও একপ্রস্ত অন্ধকার দেখে তিনি থমকে গেলেন। মনে হল কী যেন একটা জ্বলজ্বল করছিল কিন্তু কী? প্রায় চোখের নিমেষেই জিনিসটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, ভালো করে দেখার সুযোগই পেলেন না তারক গুনিন। কিন্তু এবারে তার

ক্রমাগতই মনে হতে লাগল কেউ বা কিছু যেন তার ওপর সমানে নজর রেখে চলেছে। তিনি ব্যাপারটাকে আর অত পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

গ্রামের পুরোনো বটতলায় পৌঁছে হঠাৎ গুনিন বলল, "তোরা একটা কথা ভেবে বল তো!" তারক গুণিনের গম্ভীর গলার স্বরে সবাই এদিক ওদিক ছেড়ে গুনিনের দিকে তাকাল।

"কী বাবা?"

"এই কয়েকদিনের মধ্যে বা এই দু-তিনমাসের মধ্যে তোদের গ্রামে কেউ আত্মহত্যা করেছিল বা কেউ মারা গিয়েছিল?"

তারক গুনিনের প্রশ্নে এবারে সবাই হকচকিয়ে যায়, তাদের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি হয়।

"কী রে বল! দেখছিস কী" তারক গুনিন থেমে গিয়ে নগেনদের উদ্দেশে কথাগুলো বলে ওঠে।

"হ্যাঁ... হ্যাঁ বা...বাবা, আত্মহত্যা করেছিলেন একজন। কিন্তু আপনি বুঝলেন কী... কী...", কাঁপা কাঁপা স্বরে কথাগুলো শেষ করতে পারে না মহেন।

"ঠিক করে বল তো যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি কি ঠাকুর দেবতার সাথে কোনোভাবে যুক্ত ছিল?" প্রশ্ন করে তারক গুনিন।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে উত্তর দেয় নগেন, "হ্যাঁ বাবা তিনি আমাদের কালী মন্দিরের নতুন ঠাকুরমশাই ছিলেন। কেন বাবা? গ্রামে এখন যা ঘটছে তার সাথে কি ওঁর মৃত্যুর কোনো যোগসূত্র আছে?"

"আছে বই-কি, যাই হোক আমি একটা যজ্ঞের আয়োজন করতে চাই তবে তার আগে আমাকে একটা ব্যাপার দেখে নিতে হবে... এ... এই নগেন..."

"হ্যাঁ বাবা বলুন।"

"আমাকে এক্ষুনি তিনটে ডিম এনে দে!"

"আজ্ঞে!"

নগেন আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটে ডিম নিয়ে হাজির হয়। নগেন ডিম আনার পরেই তারক গুনিন ঝোলা থেকে একটা পাত্র বার করে আনেন। তার মধ্যে রাখা বেশ খানিকটা লাল আবিরে তিনি তার তর্জনীর অগ্রভাগ ডুবিয়ে দেন এবং মাটিতে একটা ত্রিভুজ আঁকেন। এরপর আবার ঝোলা থেকে তিনটে সাদা ধবধবে কড়ি বার করে ত্রিভুজের তিন কোণায় রেখে দিলেন। তারপর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুল সেই ত্রিভুজের মাঝ বরাবর রেখে তিনি বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়লেন। এতক্ষণে গ্রামে তারক গুনিনের আসার

খবর সবাই পেয়ে গিয়েছিল। তাই সবাই একটু আশ্বস্ত হয়ে আর যতটা সম্ভব সাহস নিয়েই বাইরে বেরিয়ে আসে অলৌকিক কিছু দেখার আশায়। তারা এসে দেখে তারক গুনিন বটতলায় বসে বিড়বিড় করে কীসব যেন মন্ত্র পড়ছেন। তার পাশে নগেন, হারান আর মহেন হাত জড়ো করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে কোনো এক যাদুবলে সবার চোখের সামনেই লাল আবিরে আঁকা ত্রিভুজটা লাল আভায় জ্বলে ওঠে। এইদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্যের শেষ আভাও ক্লান্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে পশ্চিম দিগন্তে। ত্রিভুজটা বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে জ্বলার পর তারক গুনিন তার হাতের ইশারায় নগেনকে কাছে ডাকেন এবং কড়ির মুখ বরাবর তিনটে ডিম সাজিয়ে দিতে বলেন। নগেন তার আদেশ যথাযথ ভাবেই পালন করে। এরপরে তারক গুনিন সকলকে উদ্দেশ করে তাকে একেবারেই বিরক্ত না করার জন্য সাবধান করেন। তারপর পদ্মাসনে বসে একমনে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। হঠাৎ শূন্যের দিকে তিনি তার তিনটে আঙুল তুলে দিয়ে আবার দুর্বোধ্য ভাষায় কীসব মন্ত্র জপ করেন। তারপর তিনি সেই তিন আঙুল নীচে এনে ত্রিভুজের তিন কোণায় ডিমের অগ্রভাগ বরাবর একটা সরলরৈখিক রেখা এঁকে দেন। এরপরে আবার আগের মতো পদ্মাসনে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার তার ঝোলা থেকে কী যেন একটা বার করে ডিমগুলোর মাথায় ছিটিয়ে দেন এবং ডিমগুলোর ভেতর দিয়ে হঠাৎ সাদা ধোঁয়া নির্গত হতে শুরু করে। এরপর তিনি পুনরায় চোখ বোজেন। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন প্রায় সবাই অধৈর্য হয়ে পড়েছে ঠিক তখনই হঠাৎ তারক গুনিনের সামনে রাখা সেই ডিমগুলো মধ্যে কম্পন শুরু হয়। ঠিক ডিম ফেটে মুরগির বাচ্চা বেরিয়ে আসার মতো। কিন্তু তাও তারক গুনিন চোখ খুললেন না। হঠাৎই তিনটে ডিম এক বিকট আওয়াজ করে একত্রে ফেটে যায় এবং দেখা যায় ভেতর থেকে এক কালো কুচকুচে আলকাতরার মতো তরল চ্যাট চ্যাটে পদার্থ বেরিয়ে আসছে। সেই পদার্থ বেরিয়ে এসে সারা মাটিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এবারে তারক গুনিন চোখ খুললেন। তিনি চোখ খোলার সাথে সাথেই নগেন, হারান এবং গ্রামের আরও কয়েকজন তারক গুনিনের দিকে ছুটে আসে। তাদের সবাইকে আশ্বস্ত করে তারক গুনিন বললেন, “তোরা ভয় পাস না। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই পিশাচকে পরাজিত করার চেষ্টা করব। তোদের ওই ঠাকুরমশাই মৃত্যুর সময় ভয়ানক দোষ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর আত্মা ভয়ানক প্রেতযোনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই প্রেতযোনি যেমনই ভীষণ শক্তিশালী তেমনই ভীষণই প্রতিহিংসাপরায়ণ সঙ্গে অসম্ভব ধূর্ত। বলা যায় না হয়তো এখানেই কোথাও সেই পিশাচ লুকিয়ে আমাদের

দেখছে ও সমস্ত কথোপকথন শুনছে!" শেষের কথাগুলো শুনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটা ব্যক্তি একেবারে বিদ্যুৎ ঝটকা লাগার মতো কেঁপে উঠল। কেউ কেউ রামনাম জপতেও শুরু করল।

"আহা তোরা এত ভয় পাস না। জানবি যত বেশি ভয় পাবি তত ওই প্রেতযোনি আরও তোদের ভয় দেখাবে!" গুনিনের ভারী গলার স্বরে এবারে সবাই যেন একটু হলেও আশ্বস্ত হয়।

"আচ্ছা শোন তোরা। এখন প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের কাছে খুব দামি। যা যা করতে বলছি মন দিয়ে শুনবি এবং তাই তাই করবি। সাবধান! যদি এদিক থেকে একটু ওদিক হয়েছে তাহলে সব শেষ!" গুণিনের কথায় সবাই এবারে একটু থতমত খেয়ে যায়।

"আমি এখানে আজ ঠিক রাত ১২টার পরেই একটা সাধনা করব। এই সাধনায় আমায় নিজস্ব সমস্ত শক্তি উৎসর্গিত করতে হবে। তবে তার আগে এই পুরো গ্রামের সীমানাকে বন্ধনী দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে। তার জন্য আমার সাহসী কয়েকজনকে দরকার। বল কারা করবি? চিন্তা করিস না। তোদের প্রত্যেককে আমি গাত্রবন্ধনী করে দেব। তবে তোদের একলাই যেতে হবে সীমানা বন্ধনী করতে। তোদের শুধু এই জিনিসটা দিয়ে সমস্ত গ্রামকে ঘিরে ফেলতে হবে", এই বলেই তিনি তার ঝোলা থেকে কী যেন একটা বার করলেন এবং একটানা কথাগুলো বলে তারক গুনিন গ্রামের মানুষগুলোর দিকে চাইলেন। গুনিনের কথা শুনেই তাদের ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। মুখ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই বেশ কয়েকজন যুবক বয়সীরা সামনের দিকে এগিয়ে আসল। তাদের চোখেমুখে কিঞ্চিৎ ভয় খেলা করলেও, রয়েছে এক চরম আত্মবিশ্বাস। তারা যে করেই হোক নিজের ভয়কে জয় করে এই গ্রামকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। তাদের এগিয়ে যেতে দেখে তাদের বাড়ির লোকেরা হা হা করে এগিয়ে এল বাঁধা দিতে। গুনিন তাদের আশ্বস্ত করলে তারা কিছুক্ষণের জন্য একটু শান্ত হয়। এরপর গুনিন ওই যুবকদের এক এক করে বুঝিয়ে দিতে লাগল কীভাবে কী করতে হবে এবং যতক্ষণ এই গ্রাম বন্ধনী প্রক্রিয়া চলবে ততক্ষণ একটানা গুনিন এইখানে বসেই একমনে মন্ত্রোচ্চারণ করে যাবেন।

সবাইকে যে যারটা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি দেখলেন এখনও একজনকে লাগবে। কারণ আসল জিনিসটাই যে পড়ে আছে। বন্ধনের জোড় না আটকাতে পারলে তো সবকিছুই বৃথা। তাই এই মাটির সরা দিয়ে সেই দ্বারের মুখ বন্ধ করতেই হবে। এই কথা গুনিন বলতেই হঠাৎ ভীড়ের মাঝ থেকে এক ছোটোখাটো মোটাসোটা লোক বেরিয়ে এসে গুনিনের পায়ের কাছে

একপ্রকার হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গুনিন তো তার এই কাণ্ড দেখে থতমত খেয়ে যান। লোকটি বলে, "বাবা বাকি কাজটা আমায় দিন। আমি করব!" তার কথা শেষ হতেই বাকি গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে এক তীব্র কোলাহল হতে শুরু করল। গুনিন তো কিছুই বুঝতে পারছে না। অবশেষে গ্রামের এক ছোকরার কাছ থেকে সমস্তটা শুনে গুনিন মনে মনেই একচোট হেসে নিলেন। মূল ব্যাপারটা হল এই, যে লোকটার কথা এখানে বলা হচ্ছে সে হল গবানন্দ ওরফে গবা। ভীষণই সরল সাধাসিধে গোবেচারা ধরনের মানুষ বা সোজা কথায় বলতে গেলে ওর মনটা পুরোই বাচ্চাদের মতো সরল কিন্তু মাথায় এতটুকু বুদ্ধি নেই আর ভীষণই ভীতু। তার ওপর উপরি পাওনা তার এই উচ্চতা। গ্রামের অনেক লোকই ওকে ভালোবাসে কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তার পিছনে লেগে বা টিটকিরি কেটে এক স্বর্গ সুখ লাভ করে, বিশেষ করে কমবয়সীরা। তাই গবার মনে ভীষণ রাগ। সবসময় সুযোগ খোঁজে বড়ো কিছু করে দেখানোর। যাতে যারা ওকে নিয়ে মশকরা করে তাদের মুখে ভালো করে ঝামা ঘষে দিতে পারে। কিন্তু কপাল কোনোবারই তার সাথ দেয় না। প্রত্যেকবার কিছু না কিছু গণ্ডগোল সে পাকাবেই। মানে যেখানে গবা সেখানে হবে না গণ্ডগোল! নাহ, সে একেবারেই নৈব নৈব চ!

একবার গ্রামের এক মেলায় বাচ্চারা মিলে একটা ছোটোখাটো নাটকও করেছিল। নাটকের নাম দিয়েছিল "গবানন্দের গণ্ডগোল!"

সে যাক গিয়ে, এবারে আসল কথায় আসা যাক। সবাই বলতে শুরু করল, "না না ও আবার কী করবে?" ; "ওর দ্বারা এইসব হবে না, উলটে আরও বিপদ বাড়বে আমাদের", আর একজন বলল, "উঁহু নিজের বউকে পায় যমের মতো ভয় সে নাকি আবার একা একা যাবে এই অন্ধকারে বাউডিহির সীমানা রক্ষা করতে!" আর এক দল যুবক বলল, "আরে গবাদা যাও যাও বাড়ি যাও। ওইসব তোমার কাজ নয়। তুমি বরং বাড়ি যাও গিয়ে বউদির পায়ে একটু তেল মালিশ করে দাও। বউদি তো খেটে খেটেই মরল তোমার জন্য। তোমার দ্বারা তো আর কিছু হল না!" বলেই ছেলেগুলো হাসতে থাকে। গবার কান লাল হয়ে ওঠে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। তারক গুনিন বুঝতে পেরে গবার কাঁধে হাত রেখে বলেন, "বাকি কাজটা ওই সারবে! ওকে এইসব কথা বলা বন্ধ কর তোরা!" গুনিনের গুরুগম্ভীর গলার স্বরে সবাই চুপ হয়ে যায়। কোলাহল থেমে যেতেই আবার শ্মশানপুরীর মতো নিস্তব্ধতা হ্রাস করে গ্রামকে। গবার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে আরও একবার নিজের মাথা গুনিনের পায়ের কাছে নামিয়ে বলে, "বাবা দেখবেন এবারে আর কোনো ভুল করব না আমি।

একদম ঠিকঠাক করে আপনার দেওয়া কাজ সম্পন্ন করব!” গুণিনের মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি খেলে যায়। এমন সরল সাধাসিধে মানুষ সে এই জীবনে অনেক কমই দেখেছে। তার ভারি পছন্দ হয়েছে গবাকে। তার মন চাইছে গবাকে বিশ্বাস করতে। অন্যদিকে প্রায় সকলেই ধন্দে পড়ে গেছে, এই অবস্থায় গবাকে কি ভরসা করা ঠিক হবে। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে মানুষের মরা-বাঁচার প্রশ্ন, সেখানে গবা!

গ্রামের মানুষের পাংশু মুখ দেখে গুনিন সকলকে আশ্বস্ত করলেন। ঝোলা থেকে একটা সিঁদুর মাখানো তাবিজ বের করে বিড়বিড় করে কী সমস্ত মন্ত্র বললেন তারপর সেটা গবাকে পরিয়ে দিয়ে গুনিন বললেন, “যাহ তোর আর কোনো ভয় নেই। কোনো প্রেত পিশাচ কিছু করতে পারবে না তোর! যতক্ষণ তোর সাথে এই তাবিজ আছে। ভুল করেও এই তাবিজ খুলবি না! তোকে শুধু এই মাটির সরা একটা বিশেষ স্থানে বসিয়ে সিয়ে আসতে হবে, ব্যস আর কোনো কাজ নেই তোর!”

গুনিনের সমস্ত কথা সবাই ভালো করে বুঝে নিয়ে সবাই যে যার কাজ করতে বেরিয়ে পড়ল। বাকি কয়েকজন গুনিনকে তার সাধনার প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করে দিতে লাগল। গুণিন আপাতত চোখ বন্ধ করে সীমানা বন্ধনী প্রক্রিয়ার মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে পদ্মাসনে লিপ্ত হলেন।

কিন্তু এইদিকে গবা তার কাজ করতে যাওয়ার আগে মহা আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়িতে পৌঁছাল। তার মা আর বউকে খবরটা না দেওয়া অবধি কিছুতেই সে শান্ত হতে পারছে না। এই প্রথম সে এত বড়ো একটা কাজ করতে যাচ্ছে, তার ওপর তারক গুনিনের মতো সাধক মানুষ ওকে বিশ্বাস করেছে। এই কথাগুলো বলে মঙ্গলীকে একপ্রস্ত চমকে দিয়ে তার সেই অবাক মুখখানা দেখতে বড়ো মন চাইছে গবার। একমাত্র সেই যে গবার এত দুর্বলতা সত্ত্বেও তাকে মেনে নিয়েছে। রেগে গিয়ে অনেকবার অনেকরকম কুকথা বললেও সেই ক্ষোভ মনে রাখার পাত্র গবা বা তার বউ কেউই নয়। তার সংসারটাকে তো মঙ্গলীই প্রাণ দিয়েছে।

বাড়ির দাওয়ার সামনে আসতেই গবা তার মাকে বসে থাকতে দেখল। দূরের দৃষ্টি তার নেই। কাছে আসতেই বুড়ি তার ক্যানক্যানে গলায় বলে উঠল, “কে রে? কে এলি? গবা নাকি?"

গবা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, “মা! মা জানো আজ কী হয়েছে!” আনন্দে প্রায় আত্মহারা গবা।

বুড়ি আবার তার ক্যানকেনে গলায় বলল, "আহ মুরো যা! অমন ষাঁড়ের মতো চিল্লাস ক্যান?"

গবা সমস্ত কথা খুলে বলল তাকে। সমস্তটা শুনে গবার মা স্তব্ধ হয়ে যায়। "হ্যাঁ রে বাপ, তুই পারবি তো রে?" বুড়ি বলে ওঠে। গবা একটু বিরক্ত হয়ে বলে, "এই জানতাম তোমরা কেউ আমাকে বিশ্বাস করো না। মঙ্গলী কই। আমি তাকেই সব বলব। সে আমাকে অবিশ্বাস করবে না!" এই বলেই গবা হনহন করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

এইদিকে গবার মায়ের চিন্তা আরও বেড়ে গেল। মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করে সে বলল, "গবাটারে দেখো ঠাওর, বড়োই সরল বাপ আমার। ওর কোনো ক্ষেতি কোরো নে!" বুড়ি কাঁপা কাঁপা হাতে প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকায়। তারপর চোখ খুলতেই চমকে যায়। সামনে পূর্ণিমা। তাই চাঁদের আলো দিন দিন উজ্জ্বল হচ্ছে আরও। সেই আলোতেই মনে হল কেউ যেন তাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ি চোখ কচলে আরও একবার ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। এবারে সেই ছায়ামূর্তি তার অনেকটা কাছে এগিয়ে এসছে। তার ছায়া বুড়ির গায়ে এসে পড়েছে। কী ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি সে উঠোন পার করে এল কী করে। কিছু বুঝে উঠবার আগেই বুড়ির হৃদপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। ছায়ামূর্তি অনেকটা কাছে এগিয়ে আসায় এবারে বুড়ি ভালো করে দেখতে পারছে। বুড়ির মুখ যেন কেউ অদৃশ্য সুতো দিয়ে সেলাই করে দিয়েছে। কিছুতেই সে তার মুখ খুলতে পারছে না। কিছু বোঝার আগেই সেই ছায়ামূর্তি বুড়িকে হ্যাঁচরাতে হ্যাঁচরাতে বাড়ির পাশে ঝোপের আড়ালে নিয়ে চলে গেল।

এইদিকে গবা মঙ্গলীকে সমস্ত কথা বলতেই তার চোখও ছলছল করে উঠলো। "আমি জানতাম, আমি জানতাম এমন একটা দিন নিশ্চয়ই আসবে। গ্রামের লোকেরা বুঝবে, ওরা তোমাকে যতটা নিষ্কর্মা মনে করে, তুমি মোটেও তা নও। যাও তুমি আজই সবাইকে প্রমাণ করে দাও যে তুমি কতটা যোগ্য!" মঙ্গলীর কথায় এক অদ্ভুত প্রাণশক্তি পায় যেন গবা। বেরোতেই যায় কিন্তু তার আগেই দরজায় একটা ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমটায় দুজনেই হকচকিয়ে যায়। তারপর গবা বুঝতে পেরে বিরক্ত হয়ে বলে, "উফ মা দরজার কাছে ওইভাবে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে? আর একটু হলেই...! যাক গিয়ে। মঙ্গলী আমি আসি!"

"অ বউ!" বুড়ির সরু গলার আওয়াজ শুনে এবারে দুজনে থমকে যায়। "বলুন মা!" উত্তর দেয় মঙ্গলী।

"শুনলুম ওই তারক গুনিন নাকি ওরে কী একটা তাবিজ দেছে। তা ওইটা একবার

ঠাওরের পায়ে ছুঁইয়ে দিও কেমন! আর নয়তো আমারে দাও আমি ঠাওরের পায়ে ছুঁইয়ে আনছি!"

গবা বলে উঠল, "না না দেরি হয়ে যাবে। আর অত ঠাকুরের পায়ে ছোঁয়ানোর সময় নেই...!

"থাম তো বাছা। বউয়ের সাথে সোহাগ করার অনেক সময় আছে। আর ঠাওরের পায়ে তাবিজ ছোঁয়ানোর সময় নাই! উঁহু আদিখ্যেতা!"

মঙ্গলীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়। গবার কানে ফিসফিসিয়ে সে বলে, "মা যা বলছে শোনো। নাহলে জানোই তো! আবার শুরু করবে!" এই বলেই সে রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

"আচ্ছা আচ্ছা বেশ এই নাও! যা করার তাড়াতাড়ি করো!" এই বলেই গবা তার তাবিজটা খুলে তার মায়ের হাতে দিয়ে দেয়। গবা বা মঙ্গলী কেউ লক্ষ করে না, ঘর ছেড়ে বেরাতেই বুড়ির মুখে এক ক্রূর হাসি খেলে যায়।

মায়ের থেকে তাবিজটা নিয়ে সেটা গলায় গলিয়ে এবারে গবা বেরায় তার কাজে। এইদিকে বুড়ি সুযোগ বুঝে চলে যায় বা বলা ভালো শূন্যে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যায় কাছের একটা পুকুরে। তারপর একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তার হাতে ধরা তাবিজটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় পুকুরের জলে। তারপর এক ভীষণ অট্টহাসি হাসতে হাসতে বাতাসে মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

// ৯ //

মনে একপ্রস্ত আনন্দ নিয়ে গবা তার গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ভুলেই যায় যে গ্রামে এক ভয়াল পিশাচের ছায়া পড়েছে। সে নিজ মনে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। মনে মনে ভাবে সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাকি সবাইয়ের অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ওই সবার দেরিতে যাচ্ছে।

"গুনিন বাবা বিশ্বাস করে এই মহান কাজটা দিয়েছেন আর আমি কিনা তার দেওয়া সময়ের কোনো দামই দিচ্ছি না! ছিঃ ছিঃ এ বড়ো অন্যায় হয়েছে। সব হয়েছে ওই মায়ের জন্য। শেষে এমনভাবে তাবিজটা নিতে চাইল। ঠাকুরের পায়ে ছোঁয়াতে গিয়েই এতটা দেরি হয়ে গেল।"

রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে হাঁটতে থাকে গবা। হঠাৎ তার গতি রুদ্ধ হয়। কী একটা আওয়াজ এল না? মনে হল ঘাস-পাতায় চলে বেড়ালে যেমন আওয়াজ হয় সেরকম। পাশের খেতে কি কেউ আছে? কিন্তু এত রাতে অন্ধকারে কে-ই বা থাকবে খেতে? গবার ভাবনাচিন্তা হঠাৎ থমকে যায়। তার মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠতে শুরু করে। আচ্ছা এইসব ওই পিশাচের কাণ্ড নয় তো? ভয়ের চোটে গবা কাঁপা কাঁপা গলায় রামনাম জপ করতে শুরু করে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার ভুলটা বুঝতে পারে। গবা দেখে যে খেতের মধ্যে থেকে কালু এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এসে গবার পায়ের সামনে এসে লেজ দোলাচ্ছে। কালো হওয়ার দরুন গবা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি প্রথমটায়। কালু মহা আনন্দে গবার পায়ের কাছে মুখ বোলাতে থাকে, আর কুঁইকুঁই করে একটা আওয়াজ করতে থাকে। এবারে গবা একটু বাম হাঁটুটা মুড়ে নীচু হয়ে বসে আর কালুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। কালু চোখ বন্ধ করে সেই আদর গ্রহণ করে। কিন্তু পরক্ষণে চোখ খুলতেই কালু এক লাফে অনেকটা দূরে সরে যায়। হঠাৎ যেন তার চোখে কিছু একটা ধরা পড়েছে যেটা দেখে কিছুক্ষণ আগে অব্দিও যে এত শান্ত হয়েছিল তার মুখ দিয়ে তীব্র হিংসাত্মক একটা গড়গড় শব্দ বেরিয়ে আসছে। তার দৃষ্টি গবার ঠিক পিছনে নিবদ্ধ। কী আছে সেখানে?

গবা ভয়ে ভয়ে পিছনে ঘোরে। কিন্তু কোথায় কী? জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। গবা আবার সামনে ঘোরে। ইতিমধ্যে কালু তার হিংসাত্মক গড়গড় আওয়াজ ছেড়ে কুঁইকুঁই করে ডাকতে শুরু করেছে। এই ডাক ভয়ের ডাক। কিছু দেখে যেন কালু খুব ভয়

পেয়েছে। কালু যেন কিছু বলতে চাইছে গবাকে আর একভাবে তাকিয়ে আছে গবার পিছনের দিকে। অথচ গবা পিছন ঘুরলে কিছুই সে দেখতে পারছে না। এবারে কালু আরও জোড়ে চিৎকার করতে করতে ছুট লাগাল এবং পরক্ষণেই খেতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গবা ব্যাপারটাকে আর অতটা পাত্বা দিল না। সে নিজের কাজ করতে শুরু করল।

বেশিক্ষণ হয়নি, হঠাৎ গবার মনে হয় ওর পিছনে যেন কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা দমবন্ধ করে দেওয়া অস্বস্তি হচ্ছে তার। তার মধ্যে একটু একটু করে ভয়ের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সে একবার তার গলায় ঝোলানো তাবিজটায় চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেই কাজ করতে যাবে অমনি ঠিক ওর ঘাড়ের ওপর ঠান্ডা নিঃশ্বাস এসে পড়ল। গবা আঁৎকে উঠে খানিকটা দূরে ছিটকে যায়। এবারে সে বুঝতে পারে, এতক্ষণ অন্ধকার ভেবে যে ভুল গবা করছিল আসলে সেখানে একটা নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে রয়েছে। যার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। যার উপস্থিতি এই অন্ধকারের মধ্যেও আরও একপ্রস্ত গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে। এই অবয়বে জোনাকির মতো শুধু চারটে সবুজ জ্বলজ্বলে জিনিস ক্রমাগত জ্বলছে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় ওটা চোখ, হ্যাঁ চারটে চোখ! ভাটার মতো জ্বলছে সেগুলো।

তীব্র আর্তনাদ করে গবা উঠে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু একি! তার হাত পা কিছুই সে নাড়াতে পারছে না। তার সমস্ত শরীর যেন এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রাখা হয়েছে। এমনকি গলা থেকে একটাও স্বর বেরোচ্ছে না। পাথরের মতো বসে থাকা ছাড়া এবারে গবার আর কিছুই করার নেই।

সে যেন বুঝতে পারছে এই ভয়ানক পিশাচের হাত থেকে তার মুক্তি নেই। কিন্তু... কিন্তু গুনিন বাবা যেন কী বলেছিল একটা! কী একটা কথা গবার মনে পড়েও পড়ে না। এবারে হঠাৎ করে মনে পড়াতে গবার সারা শরীরে এক শীতল স্রোত খেলে যায়। তার মনে পড়েছে গুনিন বলেছিল যতক্ষণ না তাঁর দেওয়া এই জিনিসটা দিয়ে সমস্ত গ্রামকে বন্ধনী করা হচ্ছে ততক্ষণ সেই পিশাচ ওঁৎ পেতে থাকবে সবার ক্ষতি করার। কিন্তু সেই পিশাচের ফাঁদে পা দিলেই সর্বনাশ! তাই একমনে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে সেটা করে যেতে হবে। একটু ভুল হলেই সেই পিশাচ সকলকে মেরে তার রক্ততৃষ্ণা মেটাবে। এমনকি বাদ যাবে না সাধনায় বসা ব্যক্তিও। তাই যতক্ষণ না পুরো গ্রাম বন্ধনী হচ্ছে ততক্ষণ কেউ নিরাপদ নয়। সরাটা গবার হাতে তুলে দিয়ে গুনিন বলেছিল, যে সেই শেষ ব্যক্তি যে এই বন্ধনীর শেষ পর্যায় সম্পন্ন করে ফিরে আসবে। আর যতক্ষণ এই তাবিজ তার সাথে থাকবে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে

না। তবে এই তাবিজ গলা দিয়ে খোলা চলবে না। তাহলেই তাবিজের শক্তি অপসারিত হবে।

তবে কি সেই সময় তাবিজ খুলেই ভুল করল গবা? গবার চোখ ফেটে জল আসে। মৃত্যুর আগেও সে কারোর কোনো কাজে লাগল না। বরং গ্রামের মানুষের বিপদ সে আরও বাড়িয়ে দিয়ে চিরনিদ্রায় পাড়ি দেবে। মঙ্গলীর কথা খুব মনে পড়ছে তার। বুকটা কষ্টে ফেটে যাচ্ছে। মরার আগে একবারও তার সাথে আর দেখা হবে না। কথা হবে না।

বড়ো অসহায় লাগে গবার। সে এখন চাইলেও ছুটে গিয়ে কাউকে কিছু বলতেও পারবে না। সেই পিশাচ তার অনেকটা কাছে চলে এসছে।

গবার বুকের কাছটা এবারে হাপরের মতো ওঠানামা করতে শুরু করেছে। রাতের ঘন নিস্তব্ধতা ভেদ করে অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে চলা হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির আওয়াজ শুনে গবা নিজেই চমকে ওঠে। তার কানে এবার হঠাৎ একটা সুর আসছে। প্রথমটায় খুব মৃদু। তারপর সেই সূক্ষ্ম আওয়াজটাই গবার মাথার শিরা উপশিরা যেন ভেদ করে দিতে লাগল। ক্রমে ক্রমে অসহনীয় হয়ে ওঠে আওয়াজটা। বেশিক্ষণ সহ্য করতে হয় না। তার আগেই গবার চোখে অমানিশার কালো পর্দা নেমে আসে।

****

"কতক্ষণ হয়ে গেল এখনও গবাদার আসার নাম নেই, ধুর! এইজন্যই বলছিলাম ওর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। ওকে বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে আমদের!" তীব্র রাগের সহিত কথাগুলো বলে ওঠে বন্ধনী করতে যাওয়া যুবকদের মধ্যে এক যুবক, রহিম।

"ঠিকই বলেছিস ভাই!" রহিমকে উদ্দেশ করে সদানন্দ ওরফে সদাও এক কথা বলে ওঠে, "এরকম গুরুতর একটা সময় গবাকে পাঠানো একদম ঠিক হয়নি!" "গবা যদি ভুলভাল কিছু করে তাহলে তো আমরা সবাই মারা পড়ব!" কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে গ্রামের আর এক যুবক নিমাই।

"আহ তোরা থাম তো! ওই দ্যাখ গবা আসছে!" নগেনের কথায় এবারে সকলে একত্রে ঘুরে তাকায় গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের দিকে। সেইদিক থেকে একটা ছোটো অবয়ব দেখা যাচ্ছে। দুলতে দুলতে সে এইদিকেই এগিয়ে আসছে।

"গবার সাহস তো বেশ বেড়ে গেছে দেখছি। দ্যাখ দ্যাখ কেমন হেলতে দুলতে আসছে, যেন কিছুই হয়নি। এই অন্ধকারে সীমানা বন্ধনী করতে গিয়ে তো আমার পিলে চমকে উঠেছিল!" বলে ওঠে রহিম।

“যা বলেছিস! কিন্তু গবাকে যেন একটু বেশিই চিন্তামুক্ত লাগছে না? আমার মন থেকে তো এখনও ভয় যাচ্ছে না। কী জানি কী হয় আজ রাতে!”

গ্রামের যুবকদের কথার মাঝেই গবা এসে উপস্থিত হয় ওদের সামনে। গবা আসতেই গুনিন মন্ত্রোচ্চারণ থামিয়ে চোখ মেলে তাকায়। তার গুরুগম্ভীর গলার স্বর আবার শোনা যায়। সেই স্বরে স্পষ্ট আদেশের সুর।

“তোদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবারে সকলে নিজের নিজের ঘরে ফিরে যা। আর খবরদার কাল ভোরের আলো ফোটা না অবদি বাড়ির বাইরে কেউ পা রাখবি না!” এই বলে গুনিন আবার ধ্যানমগ্ন হলেন। সবাই গুনিনকে জোড়হাতে প্রণাম করে বাড়ির দিকে রওনা হল। শুধু কেউ খেয়াল করল না অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা গবার মুখে ফুটে উঠল এক ক্রূর শয়তানি হাসি, ধীরে ধীরে সে মিলিয়ে গেল রাতের গভীর অন্ধকারে।

// ১০ //

রাতের ঘন কালো অন্ধকার আরও গভীর থেকে গভীরতায় মিশে গেল। চারপাশটা এতটাই নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে যে একটা পিন পড়লেও তার শব্দ কানে তীক্ষ্ণভাবে এসে ঠেকবে। রাতচরা পাখিরা আজ অনেকদিন হল এই গ্রামের ঠিকানা ভুলেছে। জোনাকি, ঝিঁঝি পোকা কোনো কিছুরই অস্তিত্ব আর এখানে বাকি নেই।

সবাই ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকলেও কারোর চোখে ঘুম নেই। অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে আছে সবাই। এবারে সকলে শুনতে পেল বটতলার কাছ থেকে এক জলদগম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে। সকলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবারে শোয়ার তোড়জোড় শুরু করল।

প্রায় অনেকক্ষণ একনাগাড়ে মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে শুনতে সকলে এক গাঢ় ঘুমের দেশে তলিয়ে গেল। শুধু জেগে রইল একজন! শ্রীপতি! তার চোখে কোনো ঘুম নেই। আজ রাতে কী হতে চলেছে সেই আশঙ্কায়। তার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। শুধুই কি সেই ভয় নাকি তার ভয়ের পিছনে আছে অন্য কোনো কারণ যা উনি ছাড়া কেউ জানেন না?

চারিপাশের পরিবেশ যেন ক্রমেই ভারী হয়ে উঠেছে। উফ দম নেওয়াও যেন দুষ্কর হয়ে উঠছে। আর শান্ত হয়ে বসে থাকতে না পেরে বিছানা থেকে উঠে জানলাটা খুলে দিলেন শ্রীপতি। তার চোখ চলে গেল দূরে সেই বটতলার দিকে। বিশাল বড়ো বটের মাথাটা এই অন্ধকারেও খানিকটা দেখা যাচ্ছে, হয়তো যজ্ঞের আগুনের কারণেই কিছুটা দৃশ্যমান হয়েছে। আর তাতেই শ্রীপতির মনের ভয়টা আরও গাঢ় হল। একবার যাব? যাওয়া কি ঠিক হবে? মনে মনে ভাবে শ্রীপতি।

কৌতূহল বড়ো বিষম জিনিস। খুব কম মানুষই এর থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। শ্রীপতিও এই আওতার বাইরে পড়েন না। তাই তিনিও এই অন্ধকারেই দরজাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। খুব সন্তর্পণে চারিদিকটা খেয়াল করে এসে পৌঁছালেন বটতলার অনেকটা কাছে। তারপরে অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আড়ালে। ওইদিকে গুনিন একমনে সাধনা করতে ব্যস্ত। হোমের বেদি থেকে পোড়ার চড়চড়ে অস্বস্তিকর আওয়াজটা এই নিস্তব্ধ পরিবেশে যেন তীব্রতর হয়ে শ্রীপতির কানে এসে বাজছে। চারিদিকে কেমন অন্ধকার পাক খাচ্ছে।

এর মাঝেই হঠাৎ কিঞ্চিৎ দূরে, অন্ধকারের মধ্যেই কিছু যেন একটা নড়েচড়ে উঠল। শ্রীপতি ভালো করে বোঝার জন্য নিজেকে আরও একটু অন্ধকারে মিশিয়ে দিয়ে সেইদিকে একভাবে চেয়ে রইলেন। কিন্তু এবারে তার শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ওই জমাট অন্ধকারের মধ্যে থেকেই চারটে জ্বলজ্বলে জিনিস, না না চারটে... চারটে চোখ! যজ্ঞে বসে থাকা গুনিনের দিকেই নিবদ্ধ। চোখগুলো ভাটার মতো জ্বলছে!

গুনিন একমনে মন্ত্রোচ্চারণ করেই যাচ্ছে। তার পিছনে অনতিদূরে সেই ছায়ামূর্তি যেন হঠাৎ একটু নড়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে। শ্রীপতির কানের পাশ থেকে একটা গরম তরল ধীরে ধীরে বেয়ে নীচে নেমে গেল। তার ভয় লাগতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে সে এখান থেকে পালাতেও পারবে না। অন্ধকারের আড়াল ছেড়ে বেরোলেই সেই ছায়ামূর্তির চোখের সামনে চলে আসবে সে। তাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে সে। এইদিকে সেই ছায়ামূর্তি এখন এসে দাঁড়িয়েছে গুনিনের সামনে। যজ্ঞের আগুনের আলোয় এখন তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কী অদ্ভুত! কোথায় সেই চার চোখ? কোথায় সেই অস্বাভাবিকতা? এ তো গবা! চমকে ওঠে শ্রীপতি। গবা এখন এখানে কী করছে? আর ও কি? এ কি সত্যি ওদের গ্রামের হাবাগোবা গবা? গবার চেহারায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তার সমস্ত সারল্যতা যেন হারিয়ে গেছে। বদলে সেখানে জায়গা করেছে এক আদিম হিংস্রতা!

হঠাৎ গুনিনের চোখেমুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত অস্বস্তি। সে যজ্ঞ থামিয়ে হঠাৎ চোখ খুলল এবং খুলতেই সে চমকে কিছুটা পিছনে সরে গেল। গবার মুখে এবারে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। গুনিন ভয়ে ভয়ে তাকে বলল, "তু... তুই এখা... এখানে কী করছিস? বলেছিলাম না কাউকে..." কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথায় যেন সেই সুর বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুর যেন মাথার সমস্ত শিরা উপশিরা ছিঁড়ে দিতে লাগল। গুনিন দুটো হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে বসে থাকলেন। শ্রীপতিও বেশিক্ষণ এই সুর সহ্য করতে পারলেন না। ওই অন্ধকারেই তিনি চোখ বুজলেন। তিনি দেখতেও পেলেন না সামনের বটতলায় গবার শরীরটা ধীরে ধীরে ঘন কালো এক ছায়ামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। গুনিনের দেহ থেকে এক হ্যাঁচকা টানে ধড় থেকে তার মুণ্ড আলাদা করে সেই রক্তে নিজের রক্তলালসা মেটাতে লাগল শয়তান রক্তপিশাচ! কামড়ে ছিঁড়ে নিতে লাগল শরীর থেকে দলা দলা মাংস! তীব্র আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করে দিল পেটের কাছটা! সেখান থেকে বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি গ্রোগাসে গিলতে লাগল সে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কত জন্মের ক্ষুধা মেটাচ্ছে শয়তানটা!

নিজের রক্তলালসা মিটিয়ে সেই পিশাচ এবারে এক পৈশাচিক হাসিতে মেতে উঠল। তারপর গুণিনের ছিন্নভিন্ন প্রাণহীন দেহটাকে কোনো তুচ্ছ বস্তুর ন্যায় তুলে নিমেষের মধ্যে গ্রামের নদীর পারের কাছে চলে এল আর এক হ্যাঁচকা টানে একরাশ ঘৃণা নিয়ে দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাঝ নদীতে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে সেই পিশাচ অদৃশ্য হয়ে গেল। এইদিকে নদীর স্রোতের টানে গুনিনের দেহ ভেসে চলে গেল দূর থেকে বহুদূরে।

// ১১ //

ভোরের সূর্যের প্রথম আলো মুখে পড়তেই হঠাৎ করেই জ্ঞান ফিরে এল শ্রীপতির। জ্ঞান ফিরতেই ধড়ফড় করে উঠে বসেন শ্রীপতি। এদিক ওদিক চাইতেই তার চোখ যায় বটতলার দিকে। গুনিন কই গেল? কাল রাতে কী হল? প্রশ্নগুলো মাথায় আসতেই তিনি বটতলার দিকে ছুটে গেলেন। আর সেখানে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তার চোখ কপালে উঠল। যজ্ঞের বেদির আগুন হয়তো অনেক আগেই নিভে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে রাখা জিনিসটা দেখেই আঁৎকে উঠলেন শ্রীপতি। গুনিনের ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাথাটা যজ্ঞের আগুনে ঝলসে গেছে। একটা হালকা ধোঁয়া হাওয়ায় ভেসে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এক উদ্ভট মাংস পচার গন্ধ আসছে তা থেকে। শ্রীপতির গা গুলিয়ে উঠল। কয়েক পা পিছিয়ে এসে নগেন, হারানের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন তাদের বাড়ির দিকে।

গত রাত্রে কারোরই ঘুম সেরকম গভীর হয়নি। তাই ভোর ভোর আধোঘুমে এমন হাক ডাক চিৎকার শুনেই নগেনের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটায় বুঝতে না পারলেও পরে শ্রীপতির গলা বুঝতে পেরে নগেন সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে শ্রীপতি নগেনের দরজায় একের পর এক ঘুষি মেরে চলেছেন।

দুম দুম দুম...

নগেন দরজা খুলতেই তিনি নগেনকে জাপ্টে ধরলেন। নগেন জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি নগেনকে নিয়ে চললেন বটতলার দিকে। এইদিকে এত চিৎকার চেঁচামেচিতে আরও অনেকে বেরিয়ে এসেছে। তারাও একত্রে বটতলায় জড়ো হল। সবাই এসে গুনিনের ঝলসানো কাটা মাথা দেখে আঁৎকে ওঠে। বয়স্ক লোকেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এবারে আর কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না এই আশঙ্কায় সবাই হায় হায় করতে শুরু করল। না জেনেশুনে যে পাপ, যে অন্যায় তারা করেছে তার অভিশাপ থেকে কারোর নিস্তার নেই, কারোর না...

****

“কী বলছেন কী আপনি? গবা? না না সে এরকম কাজ করতেই পারে না। আপনার নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে!” অবিশ্বাসের সুরে কথাগুলো বলে ওঠে গ্রামের এক প্রবীণ হারাধন বিশ্বাস।

হারাধন বাবুর প্রত্যুত্তরে শ্রীপতি বলে, “আমি ঠিকই বলছি! কোনো ভুল হচ্ছে না আমার!

আমি কাল নিজের চোখে গবাকে বটতলায় মাঝরাতে আসতে দেখেছি!”

“মাঝরাতে আপনি ওখানে কী করছিলেন?” এবারের প্রশ্নটা গ্রামের এক যুবকের।

যুবকের কথার সম্মতি জানিয়ে এবারে সমবেত কণ্ঠে সবাই বলে ওঠে, “ঠিক তাই, অত রাতে আপনি একা বেরোলেন কী করে? গুনিন বাবা তো বারবার বারণ করেছিলেন আমাদের বেরোতে!”

“আমার ওই গুনিনের ওপর কোনো বিশ্বাস ছিল না, প্রথম থেকেই”, ভারী গলায় কথাগুলো বলে ওঠে শ্রীপতি। “যে কিনা এত বড়ো এক সাধক সে কিনা গবাকে দিল এত বড়ো একটা কাজ করতে। আরে গবা কি এইসব কাজের যোগ্য নাকি? আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা অঘটন ঠিক ঘটবে আর হলও তাই। কাল রাতে তো নিজের চোখেই দেখলাম। বেশ আপনাদের যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে চলুন এক্ষুনি গবার বাড়ি। জিজ্ঞেস করুন কাল মাঝরাত অবধি সে কোথায় ছিল?”

সবাই শ্রীপতির কথায় সায় দেয়। সবাই সমবেত হয়ে গবার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়।

“গবা... আরে এই গবা... দরজা খোল!”

গবার বাড়ির সামনে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে একপ্রকার হইহট্টগোল জুড়ে দিল। কিন্তু ঘরের ভেতর দিয়ে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

“কী ব্যাপার বলুন তো কোনো সাড়াশব্দই তো নেই!” হারাধনের কথায় নগেন বলে, “ব্যাটা পালিয়েছে মনে হয়!”

এবারে হারাধন সবাইয়ের উদ্দেশে বললেন, “এই দরজা ভাঙো তো সবাই!”

সবাই একত্রিত হয়ে দরজায় প্রথমে করাঘাত তারপর জোরে জোরে আঘাত ফেলতে শুরু করল। সকলের সম্মিলিত আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল সদর দরজাটা। সবাই ভেতরে ঢুকে গবার খোঁজ করতে শুরু করল। কিন্তু কোথায় সবাই? বাড়ি তো পুরোই ফাঁকা। এরই মাঝে বিশাখার এক আর্তচিৎকারে সবাই একটু চমকে উঠল। বিশাখা মানে গবাদের প্রতিবেশী। সবাই মিলে ছুটল সেদিকে যেদিক থেকে চিৎকার ভেসে এল। পুকুরঘাটের দিকে গিয়ে তারা যা দেখল তাতে সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। একপাশে বাসন নীচে ছড়িয়ে রয়েছে আর তার পাশে বিশাখা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর পুকুর ঘাটের কাছে পড়ে আছে দুটো মৃতদেহ। গবার মা আর বউ। দুজনেরই মাথা ধড় থেকে আলাদা আর সমস্ত শরীর ছিন্নভিন্ন। লাশ দুটো থেকে রক্ত পুকুরের জলে মিশে এক লালচে আভা ধারণ করেছে। এই দৃশ্য দেখে কয়েকজন ওখানেই মূর্ছা গেল। বাকি কয়েকজন গেল

গবার খোঁজ করতে। শ্রীপতির পক্ষে এত নৃশংসতা সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। তার শরীর খারাপ করতে শুরু করেছে। ওখানে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসে সে। বিকেলের দিকে গবার ছিন্নভিন্ন মুণ্ডহীন আধখাওয়া দেহ পাওয়া যায় গ্রামের সীমানায় অবস্থিত জঙ্গলের মধ্যে থেকে। গ্রামের লোকেরা মিলেই গবা আর তার পরিবারের সবার দেহ সৎকার করে ফিরে আসে বাড়িতে। আবার একটা রাত। আবার একটা মৃত্যু। নিজেদের অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে এক তীব্র আশঙ্কায় শিকারীর শিকার করার অপেক্ষায় ভাবলেশহীন হয়ে বসে থাকে বাউডিহির মানুষেরা।

// ১২ //

এক নির্জন গ্রামের নাম না জানা নদীর পারে শ্মশানের অন্ধকারে একা একা বসে আছে এক তান্ত্রিক। এই ১৫ বছরে সে অনেক জায়গায় ঘুরেছে, অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যেও এসেছে। দিনের পর দিন কঠিন সাধনার মাধ্যমে নানান শক্তি সে অর্জন করেছে। কিন্তু এখন তার কিছু বিশেষ শক্তি লাভের পালা আর তার জন্য তাকে করতে হবে আরও ভয়াবহ কিছু সাধনা। সেই সাধনার জন্য দরকার একটা শবদেহ। সেই কারণেই সে এই নির্জন শ্মশানঘাটে বসে আছে শবদেহের অপেক্ষায়।

এমন সময় সে দেখতে পায় নদী বেয়ে একটা মৃতদেহ ভেসে আসছে। তান্ত্রিকের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। তাহলে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু মৃতদেহটা কাছাকাছি আসতেই সে কিছুটা থমকে যায়। কারণ মৃতদেহটি মুণ্ডহীন এবং ক্ষতবিক্ষত। শুধু তাই নয়, দেহ থেকে অনেক মাংস যেন খসে পড়েছে। তান্ত্রিক একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে দেহটাকে দাঁড় করায় তারপর সেটাকে টেনে পাড়ে নিয়ে আসে। দেহটার এমন অবস্থা দেখে তার কৌতূহল যেন আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ সে বুঝতে পারে এইভাবে মুণ্ডচ্ছেদ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে দেহটাকে মাটিতে তুলে এনে এক বিশেষ সাধনায় বসে।

দু-চারটে শুকনো কাঠ জড়ো করে তাতে আগুন জ্বালায়, তারপর তার ওপরে চাপিয়ে দেয় একটা মাটির সরা। কাঁধের পুটলি থেকে বের করে আনে কিছু বিশেষ উপাচার। সেই উপাচারগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করার পর জলে ভেসে আসা শবদেহটা থেকে একটুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে তার ভেতরে দেয়। সেই সাথে একটা বিশেষ গুঁড়ো ছড়ায় সরার ওপরে। তৎক্ষনাৎ সড়ার ওপর আগুন জ্বলে ওঠে। চারিপাশ ধোঁয়ায় ভরে যায়। সেই ধোঁয়ায় দৃশ্যমান হয় এক বীভৎস মূর্তি। তার দেহ যেন নরকের গহীন অন্ধকার হতে উঠে এসেছে। সবচেয়ে ভয়ানক তার ঊর্ধ্বতন অংশ। তার দুটো মাথা সাথে চারটে সবুজাভ জ্বলজ্বলে চোখ। চোখগুলো ভাটার মতো জ্বলছে। তান্ত্রিক দেখল সাধনায় বসা এক ব্যক্তির শরীর থেকে অনায়াসে সেই পিশাচ ছিঁড়ে ফেলল লোকটার মুণ্ড। তারপর তার শরীরটাকে প্রবল আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। শরীরের সমস্ত রক্ত এক লহমায় শুষে নিল। পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে গ্রোগাসে সেইগুলো খেতে শুরু করল। তারপর এক তীব্র ঘৃণা নিয়ে দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে। পিশাচ অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই চারিপাশের ধোঁয়া কেটে গেল।

তান্ত্রিকের কপালে দেখা গেল বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুণ্ডচ্ছেদ করার আগে সে সেই ব্যক্তির মুখ দেখেছে। তাকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি তার। চাঁদডুবি গ্রামের নামকরা তারক গুনিন। আর নদীর ঘাটটা চিনতেও তার বেশি দেরি হয়নি। এই ঘাট তার বহুদিনের চেনা। তার ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই নদীর ঘাটের সাথে। সে বুঝতে পারে তার এখন কী করণীয়। সাথে সাথে নিজের পুটুলিটা নিয়ে সে পা বাড়ায় উত্তরের দিকে, কারণ সেইদিকেই তো রয়েছে বাউডিহি গ্রামের পথ।

// ১৩ //

"আরে এত চিন্তা করিস না! আমরা ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাব।" তীর্থর কথাগুলো শুনে জানলা থেকে মুখ ঘোরায় নীল। তার চোখেমুখে তীব্র বিষণ্ণতার ছাপ। "আর চিন্তা! যা ভয় পাই ঠিক তাই হয়। একে তো দু'ঘণ্টা লেট তার ওপর একবার এই স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে তো আবার ওই স্টেশনে। ধুর! দুপুর ১২টার মধ্যে বাউডিহির স্টেশনে নেমে যাওয়ার কথা। সেখানে দুপুর ২টো বেজে গেল, এখনও স্টেশনের মুখ দেখতে পেলাম না। তার ওপর বাউডিহি গ্রাম পেরোতে হবে। গ্রামটা তো আর নেহাৎ ছোটো নয়। এখন নাকি বিকেল হওয়ার সাথে সাথেই সব রিকশা ভ্যানওয়ালারা উধাও হয়ে যায়। তোর কথা শুনে আসাটাই ভুল হয়েছে", খানিক ধমকের সুরেই শেষের কথাগুলো বলে ওঠে নীল তীর্থকে উদ্দেশ করে। তীর্থ এবারে তীব্র প্রতিবাদ করে বলে, "আরে ট্রেন লেট করেছে এটাও আমার দোষ?"

"নাহ দোষ কারোর না! দোষ আমার কপালের!" বিরক্তি ফুটে ওঠে নীলের মুখে।

তীর্থ নীলের কথায় এবারে বোকার মতো হে হে করে হেসে ফেলে।

নীল বিরক্তি ভরে বলে উঠল, "তুই ব্যাপারটা খুব লাইটলি নিচ্ছিস। অন্য সময় হলে ঠিক ছিল। কিন্তু এলাকার যা অবস্থা!"

"আরে চিন্তা করিস না। সেরকম দেরি হলে তোর ওই বীরেনদা না কে আছে, ওর বাড়িতে আজকের রাতটা থেকে যাওয়া যাবে'খন", তীর্থ বলে উঠল।

নীলের কপালের ভাঁজ আরও সংকুচিত হয়। তীর্থের মতলব বুঝতে আর দেরি হয় না নীলের।

তীর্থ মনে মনে এটাই চাইছিল, যে করে হোক আজকের রাতটা বাউডিহিতে কাটাতে। "কী করে যে ওকে আটকাই।" নীলের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়।

ওইদিকে তীর্থ বেশ মহা আনন্দেই ট্রেন যাত্রা উপভোগ করছিল। তার মনোবাঞ্ছা যে এত সহজে পূর্ণ হয়ে যাবে তা হয়তো সে নিজেও আন্দাজ করেনি। "যাক আজই মনে হচ্ছে সমস্ত ভণ্ডামি শেষ হবে!" মনে মনে বলে ওঠে তীর্থ। তার মুখে একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

****

ট্রেন থেকে নেমেই আড়মোড়া ভাঙে তীর্থ। এই প্রথমবার কোনো গ্রামে এল তীর্থ। তাই

গ্রাম্য পরিবেশ ওর কাছে একেবারেই নতুন। প্রাণ ভরে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে নেয় তীর্থ। তীর্থ মনের আনন্দে বলে উঠল, "ভাই তোর গ্রামের ওয়েদার তো বেশ। তাই বলি কেন ছুটি পেলেই খালি গ্রামে যাব গ্রামে যাব করিস। আহঃ মনটা পুরো জুড়িয়ে গেল এখানে এসে। ভাই আমি তো..."

একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছে তীর্থ। কিন্তু তার কথা কিছুই কানে ঢুকছে না নীলের। তার কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

"আরে কী রে? কী এত ভাবছিস? আমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব? এগাব না নাকি?

"ভাই শোন দেখ পুরো অন্ধকার হয়ে এসছে। এখন বেরানো না ঠিক হবে না। আমরা বরং রাতটা এই স্টেশনে কাটিয়ে দিই, সকালে রওনা দেব", চিন্তিত স্বরে নীল বলল।

"তুই কি পাগল হলি? রাতটা স্টেশনে কাটাব মানে? এখন বিকেল ৫টা! এতক্ষণ আমি স্টেশনে থাকতে পারব না ব্যস!" তীর্থও নাছোড়বান্দা।

"উফ কেন এত জেদ করছিস? আমাদের ভালোর জন্যই বলছি রাতটা স্টেশনে কাটিয়ে দিই। তাকিয়ে দেখ একটা ভ্যান বা মানুষ কিছু দেখতে পাচ্ছিস? তা ছাড়া আমি খাবারও নিয়ে এসেছি। কোনো অসুবিধা হবে না এখানে রাতটা কাটাতে।"

"আমি স্টেশনে থাকতে পারব না ব্যস! ভ্যান নেই তো কী? হেঁটে যাব!"

"তীর্থ জেদ করিস না। এটা তোর কলকাতা নয়, যে তুই যা চাইবি তাই হবে। তোর মতলব আমি খুব ভালো মতো জানি। এইসব করতে যাস না। তোর কিছু হয়ে গেলে আমি আন্টিকে কী জবাব দেব?"

"আরে তুই এত ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিস কেন? আমি তো শুধু বলছি যে..."

"নীল দাদাবাবু না?"

তীর্থর কথা পুরো শেষ হয় না তার আগেই আর একটা নতুন গলা শুনে পিছন ফিরে তাকায় নীল আর তীর্থ।

"আরে বীরেনদা!" বলেই ছুটে যায় নীল। জড়িয়ে ধরে বীরেনকে।

"আরে আরে দাদাবাবু করছ কী?"

"উফ বীরেনদা তোমায় কতবার বলেছি আমায় দাদাবাবু বলবে না! আমি কত ছোটো তোমার থেকে।"

"কী করব বলো, সেই ছোটো থেকে দাদাবাবু বলে অভ্যেস। এত তাড়াতাড়ি কি অভ্যেস বদলাতে পারব। তা তুমি তো এবারে অনেকদিন পরে এলে!"

"হ্যাঁ সেমিস্টার চলছিল। শেষ হতেই একেবারে তল্পিতল্পা গুছিয়ে চলে এলাম!"

কথার মাঝেই এবারে পাশে দাঁড়ানো তীর্থের দিকে চোখ যায় বীরেনের। নীল বীরেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে, "আমার বন্ধু তীর্থ। এবারে ওকেও নিয়ে এলাম!"

নীল তীর্থের পরিচয় দিতেই তীর্থ এসে বীরেনকে প্রণাম করে। বীরেন ব্যস্ত হয়ে বলে, "আরেহ করছ কী? আবার প্রণাম কীসের? ওঠো ওঠো! তা তোমাদের দুজনেই কি একই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করো বুঝি?"

প্রণাম সেরে নিয়ে তীর্থ বীরেনের প্রশ্নের উত্তরে বলে, "হ্যাঁ আমাদের দুজনের একই ইউনিভার্সিটি আর একই সাবজেক্ট!"

"বাহ বাহ! তা তোমাদের ট্রেন তো লেট করেছে অনেক। তোমাদের এখন আর বেরাতে হবে না। তোমরা বরং আজকের রাতটা আমার ঘরেই কাটিয়ে দাও একটু কষ্ট করে", বীরেনের কথা শুনে তীর্থর মুখটা পুরো হাঁড়ির মতো হয়ে যায়।

"দেখো তুমি শহরের ছেলে তাই এইসব মানো না, কিন্তু গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ এখন। একের পর এক নৃশংস মৃত্যু হচ্ছে। তাই সূর্য ডোবার পর আর কেউ বাইরে থাকার সাহস করছে না এখানে!" কথাগুলো যতটা সম্ভব বুঝিয়ে বলারই চেষ্টা করে বীরেন কিন্তু তার কথায় যে জল গলেনি তা সে ভালোই বুঝতে পারে। এমনকি ও মনে মনে এটাও জানে যে ওইটুকু একটা ঘরে তিনজনের থাকা চলে না। তাই কোনো উপায় না দেখে বীরেন ওদেরকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়াই ঠিক মনে করে। সেই কথা বলতেই তীর্থের মুখ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে কিন্তু নীলের মুখে নেমে আসে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। বীরেন অবস্থা বুঝতে পেরে নীলকে আশ্বস্ত করে এবং ওদেরকে ৫ মিনিটের জন্য দাঁড়াতে বলে চলে যায়। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরেন কাঁধে একটা ব্যাগ আর হাতে লাল কাপড়ে মোড়া কিছু একটা নিয়ে হাজির হয় নীল আর তীর্থর সামনে। দুজনেই বেশ অবাক হয় ওই কাপড়ে মোড়া বস্তুটাকে দেখে। তীর্থ জিজ্ঞেসই করতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে বীরেন বলল, "এখন আর কোনো কথা নয়। জোড়ে পা চালাতে হবে। যা কথা বলার সব বাড়ি গিয়ে হবে। এখন চলো!" এই বলে বীরেন ওই লাল কাপড়ে মোড়া জিনিসটাকে একবার মাথায় ঠেকিয়ে কীসব যেন বিড়বিড় করল তারপর স্টেশন থেকে নেমে বাড়ির পথ ধরল। নীল এবং তীর্থ দুজনেই চুপচাপ তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

****

বাড়ির পথে যেতে যেতেই বীরেন নীলকে বলল, "নীল দাদাবাবু তুমি না তোমার বন্ধুকে

এখন এখানে না আনলেই পারতে। গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ!"

"সে কি আর আমি বুঝতে পারছি না বীরেনদা? মায়ের কাছে সব শুনেছি", বীরেনের কথার প্রত্যুত্তরে বলে ওঠে নীল, "কিন্তু ওর বড্ড জেদ। কত বারণ করলাম কিন্তু আমার কথা শুনলই না। তাই তো ওকে নিয়ে আসতে বাধ্য হলাম!" নীলের কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীরেন। "মা পইপই করে বলে দিয়েছিল এলে যেন সকালের আলো থাকতে থাকতেই আসি। কিন্তু ট্রেনটা এত লেট করবে ভাবতে পারিনি!" নীল বলে ওঠে আবার, "আচ্ছা এই অন্ধকারে বেরানোটা কি ঠিক হল বীরেনদা?"

"তুমি চিন্তা করো না দাদাবাবু! আমার কাছে এটা আছে, এটা থাকতে কেউ আমাদের ধারে কাছে আসতে পারবে না!" নীলকে আশ্বস্ত করে বীরেন। নীলের ভ্রূকুটি দেখে বীরেন বলে, "এটা ঠাকুরমশাইয়ের শেষ চিহ্ন। তিনি আমায় এটা দিয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো তিনি বুঝেছিলেন যে গ্রামে এরকম কোনো বিপদ আসতে পারে তাই আমাদের আত্মরক্ষার জন্যই এটা উনি আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন!"

"দিয়ে গিয়েছিলেন মানে উনি এখন কোথায়?" পিছন দিয়ে এতক্ষণ ধরে সব কথা শুনছিল তীর্থ, এবারে সে বীরেনকে জিজ্ঞেস করল।

বীরেন আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তিনি জাগতিক সমস্ত মায়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন!"

বীরেনের এই কথায় এবারে নীল, তীর্থ দুজনেই অবাক হয়ে গেল। বীরেন আবার বলল, "তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর দিয়েই তো এই নৃংশস হত্যালীলা শুরু হয়েছে গ্রামে। বড্ড ভালো মানুষ ছিলেন উনি। ওঁর মতো অত শুদ্ধ, পবিত্র মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি!"

নীল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে উনি হঠাৎ আত্মহত্যা করলেন কেন?"

"গ্রামের মানুষের অপমান উনি সহ্য করতে পারেননি। তার ওপর তার স্ত্রী-র বিশ্বাসঘাতকতা তাকে চরম আঘাত দেয়। এই আঘাত সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আসলে খুব নরম মনের মানুষ ছিলেন উনি!" এই বলেই থামলেন বীরেন।

"গ্রামের মানুষ ওঁকে অপমান কেন করেছিল? উনি কি কোনো খারাপ কাজের সাথে...", তীর্থের কৌতূহল বৃদ্ধি পায় কিন্তু তার কথা মাঝে থামিয়েই বীরেন একটু জোড়ের সাথেই বলে ওঠেন, "ওঁর সম্পর্কে বাজে কথা মুখেও এনো না। উনি ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন। ওঁর মধ্যে এক আশ্চর্য দিব্য জ্যোতি ছিল। যদি উনি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে

হয়তো অনেক অসহায় মানুষই একটা সুনিবিড় আশ্রয় পেত তার ছায়ায়। কারণ তিনি কাউকেই ফেরাতেন না। কী জানি হয়তো তার মৃত্যুর কারণেই এই গ্রামের ওপর কোনো অভিশাপ নেমে এল কিনা?" বীরেনের কথা শেষ হতেই তীর্থ আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বীরেন তার আগেই বলল, "এখন আর কোনো কথা নয়। আমরা জঙ্গলের কাছে চলে এসেছি। এখান থেকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমাদের বেরাতে হবে!" এই বলেই বীরেন তার গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। তার দেখাদেখি নীলও। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু তীর্থ। তার গতি কখন যে রুদ্ধ হয়েছে তা বীরেন বা নীল কেউ খেয়ালই করেনি। তীর্থ ততক্ষণে থেমে গেছে একটা অদ্ভুত সুরের আওয়াজে। কী অদ্ভুত ওরা কি কেউ শুনতে পাচ্ছে না? তীর্থের কানে তো স্পষ্ট ভেসে আসছে সুরটা। কী সুন্দর সুর! কী মায়াবি! কী যেন আছে সুরটার মধ্যে। তার মাথায় ঝিম ধরছে। আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যেন তাকে। সে কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না। ওই অবস্থাতেই সে ধপ করে নীচে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ সব নিশ্চুপ তারপর হঠাৎই একটা তীব্র চাপ অনুভব করল তীর্থ নিজের বুকের ওপর। কষ্ট করে চোখটা খোলার চেষ্টা করল সে কিন্তু চোখ খুলেও একরাশ কুয়াশা মাখা অন্ধকার ছাড়া কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেল না। কী আশ্চর্য এই গরমে কুয়াশা এল কোথা থেকে! আর ওটা ও... ওটা কী? কালো একটা অবয়ব। তার মাথার কাছে জ্বলজ্বল করছে চারটে ভাটার মতো জ্বলতে থাকা চোখ। তীর্থের হাত পা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিছুতেই সে তার হাত পা নাড়াতে পারছে না, এমনকি গলা দিয়ে স্বরটুকু পর্যন্ত বেরোচ্ছে না। ঠিক এই সময়ে পরিচিত দুজনের গলার আওয়াজ শুনে তীর্থের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। নীল আর বীরেনদার গলার আওয়াজ। অস্পষ্ট চোখে সে নীল আর বীরেনদাকে তার দিকেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখতে পায়।

তীর্থ আর চোখ খুলে রাখতে পারে না। তার মনে হয় সে যেন ধীরে ধীরে কোনো নাম না জানা অন্ধকারের দেশে হারিয়ে যাচ্ছে।

শরীরের মধ্যে তীব্র ঝাকুনি অনুভব করতে পেরে তীর্থের জ্ঞান ফিরে আসে এবং তার মুখের ওপর বীরেন আর নীলের চিন্তিত মুখ নিয়ে ঝুঁকে থাকতে দেখে ধড়ফড় করে উঠে বসে সে। তীর্থ উঠে বসতেই নীল প্রথমে তাকে একটা জলের বোতল এগিয়ে দেয়। তীর্থ বেশ কিছুটা জল ঢকঢক করে খেয়ে নেয়, তারপরে একটা লম্বা শ্বাস নেয়।

"এই তোর কী হয়েছিল বল তো? আমরা কতটা এগিয়ে গিয়েছিলাম, তারপরে কী মনে হতে পিছন ঘুরে দেখি তুই নেই। আমার তো মাথায় হাত। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসলাম দুজনে, এসে দেখি তুই নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছিস আর গোঙাচ্ছিস! তোর তো কোনো জ্ঞানই ছিল

না, কী হয়েছিল তোর?”

নীলের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না তীর্থ। কারণ সে নিজেও জানে না বা বলা ভালো বুঝতেই পারেনি যে তার সাথে কী ঘটে গেছে। ওই মায়াবি সুর কোথা থেকে ভেসে আসছিল আর ওই কালো অবয়বটাওবা কীসের ছিল! কিছুই পরিষ্কার হয় না তার কাছে। শুধু একটা জিনিস তীর্থের খুব ভালো মতো মনে আছে। সেই চারটে জ্বলজ্বলে চোখ ভাটার মতো জ্বলছিল সেইগুলো, সেই দৃশ্য মনে পড়তেই তীর্থের শরীরে একটা শিহরণ খেলে যায়।

“এখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি পা চালাও। আর সবাই একসাথে থাকো। আলাদা হয়ো না। রাস্তায় যদি কিছু দেখতে পাও বা শুনতে পাও তাহলেও দাঁড়িও না। নাও চলো ওঠো এবার। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেবে!” একটানা কথাগুলো বলে যায় বীরেন। তারপর দুজনে মিলে তীর্থকে উঠিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাঁটা লাগায় বাড়ির দিকে।

// ১৪ //

দরজায় তীব্র কড়াঘাতের শব্দে চমকে ওঠে কমলা। এখন আবার কে এল। বীরেনের আসার তো কথা নয়। আর আশেপাশের কেউ এখন আসবেও না। ভয়ে ভয়ে আওয়াজ দেয় কমলা, "ক... কে... কে?"

"আমি... আমি বীরেন। শিগগিরই দরজা খোলো!" বীরেনের গলায় আশ্বস্ত হয় কমলা কিন্তু সাথে সাথে সে অবাকও হয় কারণ বীরেন তো রাতে বাড়িতে আসে না। সে যাক গে! তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে দেয় কমলা। দরজা খুলতেই বীরেন, নীল আর তীর্থ হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢোকে। বীরেন সঙ্গে সঙ্গে দরজার হুড়কোটা তুলে দেয় আর আঁটোসাটো করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। দুজন অপরিচিত মানুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথমে চমকে ওঠে কমলা। বীরেনের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় সে। বীরেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে, "সব বলছি, আগে একটু জল দাও!"

কমলা সাথে সাথে রান্নাঘর থেকে জল নিয়ে আসে। জল খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বীরেন নীল, তীর্থের পরিচয় থেকে শুরু করে পথে ঘটা সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলে কমলাকে। সমস্তটা শুনে কমলার হাত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

"আজকের রাতটা ওরা এখানেই থাক। তুমি রাতের খাবারের আয়োজন করো। আমি ওদের ঘরটা দেখিয়ে দিই!" এই বলে বীরেন নীল আর তীর্থকে তাদের ঘরের দিকে নিয়ে গেল। কমলা ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ভয় পেয়েছে, ভীষণ ভয়। নাহ বীরেনের কথা শুনে নয়। সে ভয় পেয়েছে তখনই যখন সে দরজা খোলার সাথে সাথেই চকিতে প্রায় বিশ হাত দূরে একটা কালো অবয়বকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। তার চোখ ভুল করেনি। সেটা ওই পিশাচটাই ছিল। ওর নজর পড়েছে তীর্থ দাদাবাবুর ওপর, এবারে ও নিজের শিকার না পাওয়া অব্দি কিছুতেই থামবে না। কমলা কাঁপা কাঁপা হাতে ভগবানের নাম স্মরণ করতে থাকে। তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে যায় রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করতে।

****

রাত ৯টার মধ্যেই কমলা ডাল, দুরকম ভাজা, আলু পোস্তর তরকারি সহযোগে গরম গরম ভাত পরিবেশন করে বীরেন, নীল আর তীর্থকে। সেই সন্ধেবেলায় আসা থেকে তীর্থ কোনো কথাই বলছে না। চুপচাপ ঘরে বসেছিল। তার নাস্তিক মনে যে এরকম হঠাৎ করে চরম

আঘাত এসে পড়বে তা বোধহয় ও আশা করেনি।

খাবার দেওয়ার সাথে সাথেই নীল ডাল দিয়ে ভালো করে ভাত মেখে মুখে পুরতেই বলে ওঠে, "আহঃ বউদি তোমার রান্নার হাত কিন্তু দারুণ মানতেই হবে!"

"আরে দাদাবাবু আলু পোস্তটা খেয়ে দেখো, ওটা কমলা দারুণ করে!" বীরেন নীলকে বলেই তীর্থের দিকে চায়, সে এখনও অবধি ভাত মুখে নেয়নি, একমনে আঁকিবুঁকি কেটে যাচ্ছে ভাতের মাঝে। বীরেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে কমলাও সেইদিকে চায় আর একটু দুঃখের স্বরেই বলে, "তীর্থ দাদাবাবুর মনে হয় রান্না পছন্দ হয়নি!"

এবারে তীর্থ মুখ তুলে চায়, খানিকটা লজ্জা পায় সে। "আরে না না বউদি আসলে সন্ধের ঘটনাটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কেমন যেন একটা ফিল হচ্ছে তোমাদের বোঝাতে পারছি না। আচ্ছা বীরেনদা তারপর তো বললে না সেই ঠাকুরমশাইয়ের কী হল?"

"সব বলব। আগে তোমরা বরং খেয়ে নাও। তারপরে ঘরে গিয়ে সব...!"

"কোনো দরকার নেই রাতে বেশিক্ষণ জেগে থাকার। না জানি কখন সেই অলুক্ষণে সুর শুরু হয়ে যাবে। ওই সুর কানে একবার গেছে তো মরেছ। তাই বলছি যা কথা বলার সকালে বলবে!" বীরেনের কথা মাঝপথে থামিয়েই কথাগুলো বলে ওঠে কমলা। বীরেনও কমলার সাথ দেয়। কিন্তু নীল যে কিছুটা অবাক হয়েছে তা বোঝা যায়। "অলুক্ষণে সুর? মানে? সে আবার কী?"

নীলের কথা শেষ হতেই তীর্থ বলে, "এটা সেই সুর। আরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসার সময় একটা সুর শুনেই আমি থমকে গিয়েছিলাম। তারপর কীভাবে যেন সেই সুর আমায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। মাথাটা পুরো ঝিমঝিম করছিল, চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। আর তারপরেই তো সেই কালো অবয়ব..."

"তুমি সেই সুর শুনেছ দাদাবাবু?" তীর্থ বীরেনের বিস্ফারিত চোখ দেখে কিছুটা অবাক হয়।

"হ্যাঁ মানে..."

"সর্বনাশ করেছে। দাদাবাবু এটা তুমি আগে বলোনি কেন? হে ভগবান! শোনো দাদাবাবু রাতে যাই হয়ে যাক, যেই ডাকুক এমনকি যদি আমি বা কমলা কেউ ডাকে কোনো মতেই দরজা খুলবে না। দরকার হলে কানে বালিশ চাপা দিয়ে ঘুমাবে। আর তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। এক্ষুনি শুয়ে পড়বে চলো। আমি জানি তোমাদের এত তাড়াতাড়ি শোয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু কিছু করার নেই। কেন এইসব বলছি তা আমি কাল সকালে বলব তোমাদের!"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই বীরেন উঠে যায়। নীল আর তীর্থ কিছু বলে না, শুধু একে অপরের দিকে একবার চেয়ে খাওয়ায় মনোনিবেশ করে।

// ১৫ //

রাতের বেলা গ্রামের পরিবেশ যে একদম অন্যরকম তা নীল ভালো করে জানে। কিন্তু এই প্রথমবার গ্রামে এসে ওর এতটা অস্বস্তি হচ্ছে। অন্যসময় তো তাও রাতচরা পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ কিংবা ঝিঁঝি পোকার একঘেয়েমি আওয়াজ কানে আসত কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে পৃথিবীতে বুঝি প্রাণের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেছে।

নীলের চোখে তন্দ্রা নেমে এলেও তীর্থের কিছুতেই ঘুম আসছে না। আসলে তার কাছে এই পরিবেশটা একেবারেই নতুন। তাই তাড়াতাড়ি এর সাথে মানিয়ে নেওয়া ভীষণই কঠিন। তাই চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে সে আর সন্ধের সেই কালো অবয়বটাকে মনে করার চেষ্টা করে। কী ছিল ওটা কোনো মানুষ নাকি সত্যিই সেই...

রাত তখন কটা বাজে কে জানে হঠাৎ নীলের ঘুম ভেঙে গেল একটা খুট শব্দে। ঘুম চোখেই নীল অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করে আর পরক্ষণেই ধড়ফড় করে উঠে বসে সে। পাশে তীর্থ নেই, দরজার পাল্লাটা খোলা। মানে একটু আগের সেই আওয়াজটা দরজা খোলার ছিল। আর এ কী! এ কেমন সুর। মাথার শিরা উপশিরা যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে। মাথার একপাশটা চেপে ধরে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে নীল। বীরেন বা কমলার কথা বেমালুম ভুলে যায় সে। কারণ সে দেখতে পায় তীর্থ সদর দরজাটা খুলেও বাইরে চলে গেল। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়েছে কিন্তু তা নিয়েও নীল তীর্থের পিছু নেয়। দৌড়ানোর মতো ক্ষমতা তার নেই। কারণ তার মনে হয় তার হাত পা যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ভারী থেকে আরও ভারী হচ্ছে তার শরীর।

গলা ফাটিয়ে ডাকার চেষ্টা করে নীল তীর্থকে, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বরই বেরোয় না। তীর্থকে যেন বশীভূত করা হয়েছে, আশেপাশের কিছুই তার নজরে পড়ছে না। এইভাবে একটা সময় পরে হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যেই আরও এক গাঢ় অন্ধকারের আবির্ভাব হয়। নীল বুঝতে পারে কিন্তু তীর্থের চলনবলনে তার কোনো প্রভাবই পড়ে না। এবারে কালো অন্ধকার মাখা বস্তুটার থেকে আরও তীব্রভাবে সেই সুর শোনা যায়। এইবারে তীর্থর আচমকাই যেন সমস্ত জ্ঞান ফিরে আসে। যেন সবেমাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। কী আশ্চর্য সে বাড়ির বাইরে এল কখন? আর এখনই বা কোথায় সে। আচমকা একটা গোঙানির আওয়াজে পিছন ফিরে তাকায় তীর্থ। আধা চাঁদের আলোতে কিছুটা দৃষ্টিগোচর হয় তার সবকিছু। "নীল!"

নীলকে মাটিতে শুয়ে কাতরাতে দেখে হতভম্ব হয়ে যায় সে। ছুটে সেদিকে যেতে চায় কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় এক তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরে সেইখানেই লুটিয়ে পড়ে সে। এবারে তীর্থ দেখে সেই কালো অবয়ব! কিন্তু এবারে আরও একটু স্পষ্ট। এবারে হঠাৎ একটা মাংসপচা গন্ধ আসে তার নাকে, গা গুলিয়ে ওঠে তীর্থর। কিন্তু তার থেকেও এখন বীভৎস যে জিনিসটা সেটা হল এই পিশাচটার দেহ। তার শরীর বলতে কিছুই নেই। সারা শরীর পচাগলা মাংসে পরিপূর্ণ। তার বুকের পাজর অবধি দেখা যাচ্ছে। হাতের নখগুলো যেন শাণিত ছুড়ির ফলা। আর সবচেয়ে ভয়ানক তার দুটো মাথা। সেই চারটে চোখ এখন লাল বর্ণ ধারণ করেছে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আছে একটা বিশাল লম্বা লালচে জিভ। তা থেকে লালা ঝরে পড়ছে। এ নরকের কোন গহীন অন্ধকার থেকে উঠে এসেছে ভূমিতে। ভয়ে সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে তীর্থ আর নীলের। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে যেন তাদের কান্না পায়।

ঠিক যেমন কোনো বুভুক্ষু বাঘ চোখের সামনে শিকারকে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক সেইভাবেই সেই নরকের পিশাচটা তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এবারে। আর বাঁচার কোনো উপায় না দেখে আসন্ন মৃত্যুভয়ে দুজনেই নিজের চোখ বন্ধ করে নেয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এক গম্ভীর গলার মন্ত্রোচ্চারণ শুনে চকিতে ফিরে তাকায় তারা সেইদিকে যেইদিক থেকে এই স্বর আসছে। পিশাচের গতিও রুদ্ধ হয়েছে সেই স্বর শুনে। অনৈসর্গিক সেই পরিবেশে এক তীব্র শ্বেতশুভ্র আলোক অবয়ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। একটা পবিত্র সুবাসে চারিপাশ ছেয়ে যায় সাথে সাথে মাংস পচা দুর্গন্ধটা খানিকটা ম্লান হয়ে যায়। নিমেষে সেখানে সৌম্যকান্তি দিব্য জ্যোতির্ময় এক পুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই সাথে সেই পিশাচের পৈশাচিক উল্লাস থেমে যায় সেই সঙ্গে আস্ফালনও। নীল আর তীর্থর আড়ষ্টতাও যেন কেটে যায়। হঠাৎ একটা পাশবিক চিৎকারে নতুন করে শিহরিত হয় নীল আর তীর্থ। তারা দেখে পুণ্যাত্মা মহান সাধকের প্রতিরূপের দিক থেকে এক চোখ ধাঁধানো নীলাভ আলোকরশ্মি অব্যর্থ লক্ষ্যে আঘাত আনে সেই নরপিশাচটার ওপর। তীব্র গগনবিদারী আর্তনাদে নীল আর তীর্থর কানে যেন তালা লেগে যায়। এইবারে আর সহ্য করতে পারে না তারা। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ।

****

ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে পড়ে কমলা, এইদিকে বীরেনও আজ উঠে পড়েছে অনেক তাড়াতাড়ি। তাকে স্টেশনে যেতে হবে এক্ষুনি। কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। বীরেন সকালের প্রাকৃতিক কাজ সারতে বাইরে যাবে ঠিক সেই সময় তার

চোখে পরে পাশের ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা, ভিতরে ঘর খালি। বীরেন ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কমলাকে হাঁক পাড়তে থাকে। কমলা এসে ফাঁকা ঘর দেখে সে-ও থমকে যায়। বীরেন এবারে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য দরজা খোলে আর তখনই সে থমকে যায়। বীরেনকে হঠাৎ শান্ত হতে দেখে কমলার ভ্রূকুঞ্চিত হয়। সে-ও এসে পাশে দাঁড়ায় এবং হতবাক হয়ে যায়। নীল, তীর্থ দুজনেই অচৈতন্য হয়ে দরজার কাছে পড়ে আছে। বীরেন চিন্তিত মুখে ঝুঁকে পড়ে নীল আর তীর্থকে তাদের নাম ধরে ক্রমাগত ডাকতে শুরু করে। "নীল দাদাবাবু, তীর্থ দাদাবাবু, আরে ওঠো কী হল তোমাদের? নীল দাদাবাবু, তীর্থ দাদাবাবু, শুনতে পারছ?" ইতিমধ্যে কমলা ভেতর থেকে জল নিয়ে নীল আর তীর্থের মুখে ছেটাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে। আস্তে আস্তে উঠে বসে নীল ও তারপর তীর্থ। চোখ খুলেই তারা বীরেন আর কমলার চিন্তিত দৃষ্টির সম্মুখীন হয়। মনে করার চেষ্টা করে কাল রাতে ঠিক কী ঘটেছিল। চকিতে সবকিছু মনে পড়ে যায় নীলের। তীর্থের বেরিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সেই অপরিচিত ব্যক্তির আগমন অব্দি সমস্ত কথা খুলে বলে সে। সমস্ত কথা শুনে বীরেন আর কমলার চোখ কপালে ওঠে। কে সেই ব্যক্তি যার আগমনের সাথে সাথে এত বড়ো কাণ্ড ঘটল। এতদিন কত তান্ত্রিক, গুনিনের পরামর্শ নেওয়া হল কিন্তু কারোর দ্বারাই সেই পিশাচকে দমন করা তো দূরে থাক, বরং তাদের জীবনে নেমে এসেছে এক চরমতম অন্ধকার। সেখানে এই আগন্তুকের আগমনে এক রাতেই যেন বাউডিহির পুরো পরিবেশই পালটে গেছে। কে এই আগন্তুক তাদের জানতেই হবে। হঠাৎ করেই মনে যেন একটা আশার আলো খুঁজে পায় বীরেন আর কমলা। এই সমস্ত কথা গ্রামবাসীদের জানা দরকার। আচ্ছা সেই আগন্তুক কি এখনও গ্রামে আছেন, যদি না থাকে তবে তো...

ঠিক এইসময় হালকা একটা কোলাহল শোনা যায়। ওরা সবাই দেখে ভবেশ আর যগাদা হন্তদন্ত হয়ে তাদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে।

"ভাই বীরেন, কোনো খবর জানো? আরে বটতলায় এক তান্ত্রিকের আগমন ঘটেছে। প্রথমে তো বুঝিনি কিন্তু তারপর বুঝতে পারলাম কে তিনি!"

বীরেন অবাক হয়ে যায়। এবারে যগাও বলে, "হ্যাঁ গো বীরেনদা। তুমি বিশ্বাস করবে না। এতগুলো বছর কেটে গেছে কিন্তু এখনও সেই ছোটোবেলার মুখের সাথে কি মিল! তার ওপর সেই কটা চোখ আর মাথার সেই কাটা দাগ!"

"তোমরা কার কথা বলছ বলো তো? আমি তো কিছুই বুঝছি না!"

এবারে ভবেশ আর যগা একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আর তারপর বলে, "বটতলায়

শিবেন এসেছে রে, শিবেন। পনেরো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া আমাদের শিবু। তোর ভাই!”

বীরেনের হাত থেকে জলের গ্লাসটা পরে যায়, ধপ করে বসে পড়ে সে মাটিতে। এ সে কী শুনল? শিবু এসেছে, শিবু? এতগুলো বছর পর! অজান্তেই তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে ওঠে।

// ১৬ //

ভবেশ আর যগার কথা শুনে তখনই বীরেন উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে গেল বটতলার দিকে। সাথে কমলা, ভবেশ আর যগা-ও। নীল, তীর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু যে গতরাতে তাদের প্রাণ বাঁচাল তাকে একবার দেখার লোভ সামলাতে পারল না তারা। তাই শরীর দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বটতলার দিকে এগিয়ে গেল দুজনে।

বীরেন বটতলায় এসে পৌঁছাতেই দেখল বেশ কয়েকজন লোক জায়গাটাকে আগেই ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা চাপা কোলাহল ভেসে আসছে সেইদিক থেকে।

ভীড় সরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে বীরেন। সামনের চাতালে বসা লোকটিকে দেখে যেন সে পাথর হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। আর তারপরেই চিৎকার করে ডেকে ওঠে, "শিবু রে! শিবু! কোথায় চলে গিয়েছিলি ভাই আমার!"

এবারে সবাই চমকে ওঠে। বটতলায় এই মুহূর্তে যে সাধক বসে আছে সে শিবু? বীরেনের ভাই! এতক্ষণে কমলা, ভবেশ, যগা, নীল, তীর্থ সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে বটতলায়। বীরেন ততক্ষণে মাটিতে বসে সমানে তার ভাইকে ডেকে চলেছে। কিন্তু যার উদ্দেশে এই ক্রন্দন ধ্বনি তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই, একভাবে পাথরের মতো বসে তিনি, ধ্যানমগ্ন।

এবারে নীল বলে ওঠে, "ইনিই কাল আমাদের বাঁচিয়েছেন। ইনি কাল না থাকলে সেই পিশাচ আমাকে আর তীর্থকে... উফ!" আর বলার সাহস পায় না নীল। হয়তো বিভীষিকাময় রাতটার কথা মনে পড়তেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়। গ্রামবাসীরা অবাক হয়ে নীলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। তীর্থ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সমস্ত ঘটনাটা তাদের জানায়। সবাই হতভম্ব হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ সকলে হাঁটু মুড়ে বসে কপালে প্রণাম ঠেকিয়ে বলতে থাকে, "বাবা আপনিই পারবেন আমাদের বাঁচাতে!" কেউ বলে, "আপনিই আমাদের শেষ আশা। আমাদের বাঁচান!" গ্রামের বয়স্ক লোকেরা একটু আবেগ প্রণোদিত স্বরে বলে, "ওরে শিবু রে! একবারটি চোখ মেলে তাকা! দেখ কী দশা হয়েছে আমাদের! শিবু, ও শিবু!"

এবারে হঠাৎ সবাই লক্ষ করল সাধকের শরীর যেন একটু কেঁপে উঠল। তার মুখে একটা হালকা হাসি! এইবারে সে চোখ মেলে তাকাল। তার চোখও কি সামান্য অশ্রুসিক্ত?

সে হাত তুলে সবাইকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, "তোমরা কেউ কিছু চিন্তা কোরো না, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। এতগুলো বছর ধরে আমি সাধনা করেছি, নানা শক্তি

লাভ করেছি। আশা করছি সেই সাধনা আমার বিফলে যাবে না। তোমরা এখন এস। আমি একা থাকতে চাই কিছুক্ষণ!"

সবাই তার কথা শুনে উদ্বিগ্ন মুখে যে যার কাজে ফিরে গেল। শুধু বটতলায় দাঁড়িয়ে রইল বীরেন, কমলা, নীল আর তীর্থ।

নীলই প্রথম বলা শুরু করল, "আপনাকে যে কী করে ধন্যবাদ জানাব! আপনি না থাকলে যে কী হতো আমাদের!"

নীলের কথা শেষ হতে না হতেই বীরেন বলে, "শিবু, তুই আমাকে একদম ভুলে গিয়েছিস বল!" বীরেনের আবেগঘন স্বরে এবারে শিবু হেসে ফেলে। "দাদা তোমার শিবু আর সেই ছোটো শিবু নেই গো! তোমার শিবু এখন শিবশঙ্কর তান্ত্রিক!"

"থাম তুই! যত বড়োই সাধক হয়ে যাস না কেন, তুই আমার ছোটো শিবু ছিলি আর তাই থাকবি! এবারে চল তো, ঘরে চল, কত বছর পর এলি!"

শিবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "না গো দাদা। সাধক মানুষদের গৃহস্থ্যের বাড়িতে যেতে নেই। তাতে গৃহস্থ্যের অকল্যাণ হয়। আমি এই বটতলায় ঠিক আছি!"

বীরেন শিবুর কোনো কথাই শোনে না। বাচ্চাদের মতো জেদ করতে থাকে। কমলা, নীল আর তীর্থ সবাই মিলেই অনুরোধ করল যাওয়ার জন্য। শেষে কোনো উপায় না দেখে শিবুও রাজি হয়ে গেল তার দাদার বাড়িতে যেতে কিন্তু একটাই শর্তে, খাওয়া নিয়ে বা থাকা নিয়ে কোনো জোড়াজুড়ি করা যাবে না।

****

"তুই ঘরে বোস, আমি চট করে একবার স্টেশন থেকে ঘুরে আসি বুঝলি তো! কই গো কমলা খেতে দাও, আমি বেরাই!" বীরেন কথাগুলো বলেই নীলের দিকে তাকায়, আবার বলে, "ইস দাদাবাবু তোমাদের চোখমুখের কী অবস্থা হয়েছে! তোমরা বরং একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও! কাল রাতে তো ঠিক করে ঘুম হয়নি তোমাদের!"

বীরেনের কথা শেষ হতেই তীর্থ বলে ওঠে, "আরে সে হবে খন। আগে বউদির হাতে একটু কড়া করে চা খাই। আর তা ছাড়া এখন চিন্তা কীসের? এখন উনি এসেই গেছেন!"

নীল একেবারে অবাক হয়ে যায় আর বলে, "বাবা তুই আবার এত এক্সাইটেড হচ্ছিস যে! তোর তো এইসব ভূতপ্রেত, তন্ত্র মন্ত্র কোনোকিছুতেই তো বিশ্বাস ছিল না!"

নীলের কথা শুনে তীর্থ মুচকি হাসে।

এরমধ্যেই কমলা কড়া করে সবার জন্য চা নিয়ে আসে আর শিবেনের কথামতো তার

জন্য এক বাটি মুড়ি।

বীরেন তা দেখে বলে, "তুই শুধু মুড়ি খাবি? আর কিছু খাবি না!"

শিবেন হালকা হেসে মুড়ির বাটিটা তুলে খেতে শুরু করে। নীল, তীর্থও তাদের চা নিয়ে নেয়।

বীরেনও খেতে চলে যায়, তাকে বেরোতে হবে এক্ষুনি!

শিবেন একমনে কী যেন একটা ভাবছিল, হঠাৎ নীলের ডাকে সংবিৎ ফেরে তার।

"শিবুদা আমায় চিনতে পারছ?"

শিবেন একটু অবাক হয়। নীল বুঝতে পেরে বলে, "আমি তোমাদের পাশের গ্রামের চৌধুরি বাড়ির ছেলে! আমার মায়ের নাম বিজয়া!"

এবারে শিবু চিনতে পারে। আসলে বীরেন আর শিবেনের মা যখন ওদের বাড়িতে কাজে যেত তখন শিবেন খুবই ছোটো আর নীল তো সবে চোখ খুলে হাসতে শিখেছিল তখন। তাই কারোর পক্ষেই একে অপরকে মনে রাখা সম্ভব ছিল না। অনেকদিন পর পুরোনো দিনের সমস্ত কথা মনে পড়ে বেশ একটা স্বস্তি হচ্ছিল শিবেনের মনে।

খেয়ে নিয়ে বীরেন হাত ধুয়ে গামছা রাখতে রাখতে বলে, "কী গো দাদাবাবুরা, তোমরা বাড়ি যাবে তো? এখন তো আর রাত নেই। কোনো অসুবিধা হবে না। চলো আমার সাথে একসাথে বেরিয়ে যাবে!"

বীরেনের কথা শুনেই তীর্থের মুখ ভেটকে যায়। সেই দেখে নীল মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। বীরেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে, "দেখো দাদাবাবু অন্যসময় হলে বলতাম না, কিন্তু এখন যা অবস্থা, আমি চাই না তোমাদের বড়ো কোনো ক্ষতি হোক। এই কয়েকদিনেই আমরা অনেকজনকে হারিয়েছি। মুনিয়াকেও ওর মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি এইসবের কারণে! তোমরাও থেকো না এখানে, চলে যাও!"

তীর্থ কিছু বলতেই যাচ্ছিল, তার কথার মাঝেই গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে শিবেন, "এখন ওরা কোথাও যেতে পারবে না! ওই পিশাচের নজর পড়েছে তীর্থের ওপর। যতক্ষণ না ওর কার্যসিদ্ধি হচ্ছে ততক্ষণ ও কোনো না কোনো ভাবে ওদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে!" শিবেনের কথা শুনে বীরেনের চোখ কপালে ওঠে। "কী বলছিস রে শিবু! না না তুই যেভাবে হোক ওদের বাঁচা। ওদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় রে!"

শিবেন আশ্বস্ত স্বরে তার দাদাকে বলে, "চিন্তা করিস না। আমি আছি। তুই কাজে যা। ফিরে এসে কথা হবে!"

বীরেন উদ্বিগ্ন হয়ে কাজে বেরিয়ে যায়।

কমলা এসে ওরা কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে।

শিবেন বলে ওঠে, "না গো বউদি এখন আর কিছু খাব না। আমাকে একবার আমাদের ওই পুরোনো পুকুর পাড়ে যেতে হবে!" এই বলে উঠে দাঁড়ায় সে। পুটলিটা কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কমলা আর কিছু বলে না। রান্নাঘরে নিজের কাজ করতে চলে যায়। তীর্থ নীলকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "ওখানে উনি কী করবেন?"

নীলও খুব ধীরে ধীরে জবাব দেয়, "সাধনা!"

শিবেন কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। কী যেন সে দেখতে পেয়েছে। পিছন ঘুরে নীল আর তীর্থ-র দিকে তাকায় একবার। ইশারা বুঝতে অসুবিধা হয় না তাদের। তারাও ছুটে এসে শিবেনের সাথে পুরোনো পুকুর ঘাটের দিকে যেতে শুরু করে।

****

"আচ্ছা পুকুরে গিয়ে কী করবেন?" কথাটা জিজ্ঞেস করে নীল, অবশ্যই শিবেনকে উদ্দেশ করে।

শিবেন প্রত্যুত্তরে বলে, "রুদ্রপঞ্চঅঙ্গং সাধনা করতে হবে!"

"কী কী... রু... রুদ্র... কী সাধনা!" তীর্থ তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করে শিবেনকে।

শিবেন হালকা হাসে, "তোমাদের এইসব বুঝে কাজ নেই। তোমাদের খালি আমায় শুধু একটু সাহায্য করতে হবে তাই তোমাদের নিয়ে যাওয়া!"

নীল আর তীর্থ কিছু বলে না। চুপচাপ হাঁটতে থাকে একসাথে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তারা পৌঁছে যায় পুকুর পাড়ে।

"আচ্ছা এই সাধনা এখন করার মানে কী? না মানে আমি তো শুনেছি যে-কোনো ধরনের সাধনাই রাতের বেলায় হয়ে থাকে!" প্রশ্নটা করে নীল।

"আগে আমাকে জানতে হবে এই পিশাচের হঠাৎ আগমন কী কারণে? কী কারণে এতগুলো মৃত্যু ঘটছে? এ কি কোনো মানুষের আত্মা যে মৃত্যুর সময় কোনো দোষ পেয়ে পিশাচে পরিণত হয়েছে? নাকি কেউ ইচ্ছে করেই এই পিশাচকে ডেকে এনেছে বাউডিহির মানুষের ক্ষতি করতে, যদি তা হয়েই থাকে তবে কে করল আর কেনই বা করল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই এই সাধনা করা। রোগের কারণই যদি না খুঁজে পাই তাহলে আর রোগের চিকিৎসা করব কীভাবে তাই না?" একটানা কথাগুলো বলে থামে শিবেন। সামনে পুকুর ঘাট দেখতে পায় তারা। পুকুরটা বেশ প্রশস্ত আর আকৃতিটা খানিকটা

বর্গক্ষেত্রের মতো।

পুকুরের দিকে এগিয়ে গিয়ে শিবেন তার ঝোলা থেকে চারটে ছোটো ছোটো ত্রিশূল বের করে আনে আর তারপর নীল আর তীর্থকে ইশারায় কাছে ডাকে। ওরা কাছে আসতেই শিবেন ওদের হাতে দুটো করে ত্রিশূল দিয়ে দেন আর বর্গক্ষেত্র বিশিষ্ট পুকুরের চারকোণায় সেইগুলো ভালো করে পুঁতে দিতে বলেন।

শিবেনের কথামতো নীল আর তীর্থ খুব সন্তর্পণে পুকুরের ধার বরাবর গিয়ে চারকোণায় একটা করে ত্রিশূল পুঁতে দেয়। তারপর ওরা ফিরে এলে শিবেন ওদের একটু দূরে গিয়ে বসতে বলে, ওরাও শিবেনের কথা শুনে কিছুটা দূরে সরে যায়। কিছুটা দূরে একটা পাথরের ঢিবির ওপর গিয়ে ধপ করে বসে পরে তীর্থ। নীল গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে তার একরাশ উদ্বিগ্নতা।

অন্যদিকে শিবেন তার ঝোলা থেকে আর একটা বড়ো মতো ত্রিশূল বের করে আনে। তারপর সেটাকে নিয়ে পুকুরের মাঝ বরাবর সোজা পুঁতে দিয়ে তার সামনে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়। নীল আর তীর্থ ওই দূর থেকেই একটা গম্ভীর গলায় মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পায়।

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ওঁ নমঃ...

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ওঁ নমঃ...

এরপরে সেরকম আর মন্ত্রোচ্চারণ নীল বা তীর্থ শুনতে পায় না। বিড়বিড় করে কীসব যেন বলতে থাকে শিবেন। এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে যায়। একটা অস্বস্তি হতে থাকে শিবেনের যা তার মুখের অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট। ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তা কিছুই মগজস্থ হয় না নীল আর তীর্থের। তারা শিবেনকে অমন চিন্তিত দেখে এগিয়ে যায় তার দিকে। শিবেন ওদেরকে দেখে বলে, "এই পুকুরে নিশ্চয়ই কোনো অপকর্ম হয়েছিল!"

নীল হতভম্ব হয়ে যায় তার কথা শুনে। শিবেন আবার বলে, "যদি তা নাই হতো এতক্ষণ ধরে সাধনা করার পরেও কেন আমি সিদ্ধিলাভ করতে পারছি না? সাধনা যে সঠিক পথে এগোচ্ছে তার ইঙ্গিত পর্যন্ত পাচ্ছি না! কিছু না কিছু একটা অপবিত্র কর্ম এই পুকুরের সাথে জড়িত আছেই!"

নীল বা তীর্থ এই বিষয়ে কোনো সাহায্যই শিবেনকে করতে পারে না।

শিবেন ওদেরকে আবার তাদের জায়গায় ফিরে যেতে বলে সাধনায় বসে। কীসের একটা মিশ্রণ বার করে ছুঁড়ে ফেলে পুকুরে। তারপর নিঃশব্দে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে। হঠাৎ পুকুরের জলের মধ্যে যেন একটা আলোড়ন শুরু হয়। ফুটন্ত জলের মতো বুদবুদ উঠতে

থাকে। শিবেনের ধারণাই ঠিক হয়। তার মুখের অভিব্যক্তি পুরোপুরি পালটে যায়। চোখের মণিগুলো দপদপ করে জ্বলতে থাকে।

সে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে তার সামনে রাখা ত্রিশূলটা হাতে তুলে নেয়। পুকুরের প্রায় মাঝ হাঁটু বরাবর জলে নেমে শিবেন তার হাতের ত্রিশূলটা জলের ওপরে শুইয়ে দিলেন। স্বাভাবিক নিয়মে কিন্তু ত্রিশূলটার ডুবে যাওয়া উচিত কিন্তু সেরকম কিছুই হয় না। অদ্ভুতভাবে ত্রিশূলটা কিন্তু জলের ওপর ভাসতে থাকে। এইবারে শিবেন এক হাঁটু জলে বাম পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ালেন এবং ডান পা-টি মুড়ে ডান পায়ের গোড়ালিটি বাম পায়ের হাঁটুতে লাগিয়ে হাত দুটো মাথার ওপর সূর্য প্রণামের ভঙ্গিতে জোড় করলেন। ওই অবস্থাতেই তিনি নিঃশব্দে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। কিছুক্ষণ ওইভাবে চলার পর এইবারে একটা কালো কুচকুচে পোড়া হাত জলের বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সেটা আকুতি মিনতি করছে তাকে বাঁচানোর জন্য। শিবেনের কিন্তু সেইদিকে কোনো হুঁশ নেই। সে একমনে মন্ত্রোচ্চারণ করেই যাচ্ছে। এবারে শিবেন ওই অবস্থাতেই সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে ত্রিশূলটা হাতে তুলে নেয় এবং সেটা দিয়েই জলে যেন কী একটা আঁকিবুকি কাটতে থাকে। সেটা সম্পন্ন হতেই একটা বীভৎস আর্ত চিৎকার শুনতে পায় শিবেন। নীল আর তীর্থ দূর থেকেই সেই আওয়াজ শুনে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। এ যেন এক তীব্র যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই হাত ধোঁয়ার মতো হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। পুকুরের চারপাশের আবহাওয়া পোড়া বিশ্রী গন্ধে ভরে উঠেই মিলিয়ে গেল খানিকক্ষণের মধ্যেই। পুকুরের জলে এবারে তীব্র আন্দোলন শুরু হল। শিবেন তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে এসে ঝোলা থেকে হরিতকী, হোম যজ্ঞের ছাই, ধুনো ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরী একটা মিশ্রণ বের করে হাতের মুঠোয় নিয়ে মুখের সামনে এনে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে দিল সমস্ত পুকুরটায়। সাথে সাথে আন্দোলন থেমে যায় এবং একটা স্বর্গীয় মনোমুগ্ধকর সুগন্ধে ভরে ওঠে চারিপাশ। শিবেন বুঝল এতক্ষণে এই জলাশয় পাপমুক্ত হয়েছে। পুঁতে রাখা ত্রিশূলগুলো এই সমস্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন কালো বর্ণ ধারণ করেছিল। এতক্ষণ পরে সেগুলো পুরোনো রঙে ফিরে আসে।

শিবেন এবারে তার হাতের ত্রিশূল পূর্ব জায়গায় রেখে তার সামনে বসে মন্ত্রোপাঠ শুরু করে তার অসমাপ্ত সাধনা শেষ করার উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা দেড়েক এই একইভাবে মন্ত্রোপাঠ চলতে থাকে। অপরদিকে নীল, তীর্থ একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়ে। একঘেয়ে বসে থাকতে তাদের আর ভালো লাগে না। ওদের কাছে এই দেড়ঘণ্টা একঘেয়ে বসে থাকা ভীষণই কষ্টকর কিন্তু সাধকদের কাছে এ তো কোনো ব্যাপারই না।

একটানা তিন ঘণ্টা ধরে সাধনা করার পর ধীরে ধীরে চোখ খোলে শিবেন। পুকুর পাড় থেকে তাকে উপরে উঠে আসতে দেখা যায়।

নীল আর তীর্থ তাকে উঠে আসতে দেখে সেইদিকেই ছুটে যাচ্ছিল কিন্তু শিবেন তাদের হাত দেখিয়ে মানা করে সেইদিকে আসতে। তারপর শিবেন হঠাৎ গিয়ে পাড়ে বসলেন এবং এমনভাবেই বসলেন যেন দেখে মনে হয় কী যেন একটা তিনি একমনে পুকুরে দেখে চলেছেন। কিছু একটা বোঝার চেষ্টায় সে রত। এইভাবে অনেকক্ষণ দেখার পরে শিবেন ঝোলা আর ত্রিশূলটা নিয়ে নিজেই নীল আর তীর্থের দিকে এগিয়ে এল। তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই তীর্থ বলল, "উফ আপনি তো আমাদের অপেক্ষা করিয়ে করিয়ে মেরে ফেললেন। তা কিছু বুঝলেন? জানতে পারলেন কিছু?"

শিবেন বলে, "হুম অনেক কিছু জানলাম। চলো বাড়ি গিয়ে এইসব নিয়ে আলোচনা করা যাবেখন। তোমাদের নিশ্চয়ই এখন খুব খিদে পেয়েছে!"

"হ্যাঁ সেই ভালো বরং, পেটে ইঁদুররা সব দৌঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে!" বলে তীর্থ।

"তবে তার আগে যে ত্রিশূল চারটে পুঁতলে সেইগুলো নিয়ে আসো, তারপর একসাথে বাড়ি যাব! আর হ্যাঁ আসার সময় ওইগুলো ভালো করে একটু ধুয়ে নেবে!"

শিবেনের কথা মতো নীল আর তীর্থ পুকুরের চারকোণায় পোঁতা ত্রিশূল চারটে ধুয়ে নিয়ে আসে। তারপর তারা একসাথে রওনা দেয় বাড়ির উদ্দেশে।

// ১৭ //

আজ বীরেন তাড়াতাড়িই ফিরে আসে। তাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে কমলা অবাক হয়ে যায়। বীরেন বলে, "ও কটা দিন বাপ্পাদা সামলে নেবেখন। তাকে বলেছি আজ কতগুলো বছর পর আমার ভাই এসেছে, এবারে বাউডিহি অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে!" কথাগুলো বীরেন বলে ঠিকই কিন্তু শিবেনের মুখ থমথমে হয়ে থাকে। বীরেন তা লক্ষ করে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসে শিবেনের সামনে। ইতিমধ্যে নীল আর তীর্থও এসে যোগ দেয় ওদের সাথে।

বীরেনই প্রথম কথা শুরু করে, "কী রে তোর চোখমুখ এরকম লাগছে কেন?"

শিবেন কিন্তু চুপ করেই থাকে। তীর্থ আজ সকালে জলাশয়ের সামনে সাধনা করার কথা সমস্তটা বলে বীরেনকে। বীরেন সমস্ত কথা শুনে আবার শিবেনকে জিজ্ঞেস করে, "কী রে কিছু জানতে পারলি?"

এবারে শিবেনের গম্ভীর গলার স্বর ভেসে আসে।

"যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জি কে দাদা?"

শিবেনের মুখে এই নামটা শুনে চমকে ওঠে বীরেন।

"তুই ওঁর নাম জানলি কী করে?"

"সাধনার মাধ্যমে!"

বীরেনের চমকে যাওয়া দেখে নীল আর তীর্থ দুজনেই খুব অবাক হয়।

বীরেন বলে, "তোমাদের সেই ঠাকুরমশাইয়ের কথা বলেছিলাম না? ওঁরই নাম ছিল যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জি!"

শিবেন শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে, "ওঁর সাথে কী ঘটেছিল দাদা?"

ওদের কথার মাঝেই কমলা চা আর হালকা জল খাবার নিয়ে আসে এবং বীরেনকে সমস্ত কথা খুলে বলতে বলে। বীরেনও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করে, "বেশ কয়েক মাস আগের কথা, একদিন হঠাৎ আমাদের গ্রামে একজন সৌম্যকান্তি পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। বলিষ্ঠ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, দেহ থেকে যেন দিব্য জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দূত। সেই সময় আমাদের বর্তমান ভূস্বামী নৃপতি রায় চৌধুরী এই গ্রামে এসেছিলেন কী একটা কাজে। উনি মূলত পাশের গ্রামেই থাকেন। কিন্তু আশেপাশের দু-চারটে গ্রামের

ভূস্বামী তিনি। সে যাই হোক, তো সেদিন তিনি সমস্ত কাজ সেরে ভোর ভোরই রওনা দিয়েছিলেন। ওহ বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ওঁর সাথে ওঁর বড়ো ছেলেও এসেছিলেন। আসলে এখন উনি যেখানেই যান তার বড়ো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যান। তো সবাই যখন ফিরছিলেন তখন হঠাৎই ওঁদের এক লেঠেল ভীষণ অসুস্থ বোধ করে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন নৃপতি বাবু। ওঁরা জঙ্গলের পথ ধরেই ফিরছিলেন। ওই লেঠেল একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বসে। নৃপতি বাবু নায়েবের সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। ওঁর বড়ো ছেলে একটু এদিক ওদিক ঘুরছিলেন। হঠাৎ একটা আর্তনাদে সবাই চমকে উঠলেন। ছোটো কর্তার গলার আওয়াজ। সবাই পড়িমরি করে ছুটল চিৎকারের উৎসস্থলে। গিয়ে দেখা গেল এক ভয়ানক দৃশ্য। ছোটো কর্তা নীচে উপুড় হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছেন আর তার পাশ থেকে সরে গেল এক ভয়ানক বিষধর সাপ। নৃপতিবাবুর তো কপালে হাত। এক ছেলেকে তিনি খুইয়েছেন ছোটো থাকতে থাকতেই আর এক ছেলেকে কিছুতেই হারাতে পারবেন না। তিনি ওখানে বসেই মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। নায়েব, লেঠেলরা সবাই ছুটল গ্রামের দিকে যদি কোনো উপায় ছোটো কর্তাকে বাঁচানো যায়। বাকি লেঠেলরা ছোটো কর্তাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। তার এমন অবস্থা শুনে গ্রামেরই কিছু মানুষ তাদের বাড়িতে ছোটো কর্তাকে রাখার ব্যবস্থা করে দেয়।

সময়ের পর সময় কেটে যায় কিন্তু কেউ কোনোভাবেই ছোটো কর্তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় না। কিছুটা সুস্থ হলেও আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটো কর্তার শরীর পুরো নীলাভ বর্ণ ধারণ করে। শরীর মরা মানুষের মতো শীতল হয়ে যায়। নৃপতিবাবুর তো ছেলের এই দশা দেখে পাগল পাগল অবস্থা। ঠিক এই সময়ই নৃপতি বাবুর এক লেঠেল হঠাৎ একজনকে নিয়ে আসে। সবাই সেইদিকে ফিরে তাকায়, আর আগন্তুককে দেখেই সবাই যেন থমকে যায়। সেই বলিষ্ঠ চেহারার দেবতুল্য মানুষটাকে দেখে অজান্তেই নৃপতিবাবু সহ সবাই হাত প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকায়। সবার সমস্ত জিজ্ঞাস্যকে অগ্রাহ্য করে সে এগিয়ে যায় নৃপতিবাবুর অসাড় হয়ে পড়ে থাকা ছেলেটির দিকে। কাঁধের ঝোলা থেকে একটা জবা ফুল বের করে আনেন তিনি তারপর সেটা ছেলেটার মাথায় ছুঁইয়ে কী যেন বিড়বিড় করতে থাকেন। সেই ফুলটা ধীরে ধীরে নীলাভ হয়ে ওঠে আর ছোটো কর্তার নিস্তেজ চেহারায় পুনরায় প্রাণ ফিরে আসে। কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা তারপর হঠাৎই সবাইকে চমকে দিয়ে ছেলেটি উঠে বসল। সেই দেখে নৃপতি বাবু ছুটে গিয়ে তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। বাপ-ছেলের এমন আবেগঘন মুহূর্ত দেখে সবারই চোখে জল চলে এল।

সবার আড়ালেই সেই দেবতুল্য ব্যক্তি বিদায় নিচ্ছিলেন কিন্তু নৃপতিবাবু তা দেখতে পেয়ে ওঁকে দাঁড়াতে বললেন এবং তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। সেই দেখে সেই ব্যক্তি একেবারে হা হা করে উঠলেন, বারণ করলেন তাকে পা ছুঁতে। নিজেই নৃপতিবাবুকে দাঁড় করিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

এরপরেই আমরা সেই ব্যক্তির পরিচয় পাই। তার নাম যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তিনি অনেক দূর থেকে এই গ্রামে এসেছেন কী এক সাধনার উদ্দেশ্যে। তিনি যে পথে আসছিলেন গ্রামের দিকে সেই পথেই সেই লেঠেল যাচ্ছিল। লেঠেলকে এরকম উত্তেজিত দেখে তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করে সমস্ত ঘটনা জানেন এবং সেই লেঠেলের সাথে এখানে উপস্থিত হন। সমস্ত কথা শুনে নৃপতি বাবু ভীষণই আপ্লুত হয়ে ওঁকে নিজের সাথে রাজবাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি এক বাক্যে তা নাকচ করে দেন এবং তাকে এই গ্রামেই থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং নৃপতিবাবুও সেই অনুরোধ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেন", একটানা এতগুলো কথা বলে এবারে একটু থামে বীরেন।

এতক্ষণ বীরেনের সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনছিল সবাই। এবারে শিবেন বলল, "তুমি তো একজনের কথাই বললে আর একজনের তো বললে না!"

বীরেন হঠাৎ চমকে যায়। নীল, তীর্থ অবাক হয়ে বীরেনের দিকে তাকায়।

বীরেন বলল, "হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস। যার কথা বলিনি সে হল পাঞ্চালী। ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী!"

কথাগুলো যেন বীরেন একটা তীব্র ঘৃণার সাথে বলে ওঠে। সে আবার শুরু করে, "পাঞ্চালীও ঠাকুরমশাইয়ের সাথেই ছিল। তার রূপ একদম যেন লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো। কিন্তু তার চরিত্র একেবারে, ছিঃ। আমার বলতেও মুখে বাঁধছে। অমন দেবতুল্য মানুষের কিনা এরকম চরিত্রহীন স্ত্রী? শুধুমাত্র ওর জন্যই তাকে এইভাবে অকালে চলে যেতে হল।"

নীল কৌতূহল প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বল তো বীরেনদা। আমি তো কিছুই বুঝছি না।"

"হুম বলছি", বীরেন আবার শুরু করে, "নৃপতিবাবু ঠাকুরমশাই ও তার স্ত্রী-র থাকার ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের পুরোনো কালীমন্দিরের নতুন পুরোহিত পদে তাঁকে নিয়োগ করে রাজবাড়ি ফিরে যান। বেশ ভালোই দিনগুলো কাটছিল। গ্রামের সমস্ত মানুষকে তিনি তার সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। কাউকে তিনি ফেরাতেন না। সবাই ঠাকুরমশাইকে ভগবান সমান মানতে শুরু করল। পাঞ্চালীও তাই। সে-ও তার স্বামীকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করত।

মাঝেমধ্যেই গরীব মানুষদের তারা খাওয়াতেন। আমাদের সবার চোখে তারা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নারায়ণ।

আমার সাথেও ঠাকুরমশাইয়ের বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমি ভোর ভোর বেরাতাম স্টেশনে যাওয়ার জন্য আর উনিও সেই সময় হাঁটতে বেরোতেন। কতদিন আমরা একসাথে গিয়েছি। কত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা জেনেছি তার কাছ থেকে। কত গল্পই না করেছি। ওঁকে দেখে, ওঁর সাথে কথা বলে মনে একটা ভারী তৃপ্তি পেতাম। ওঁকে দেখলে এত আপন মনে হতো। মনে হতো... মনে... হতো যেন আমার বড়ো দাদা আমার মাথার উপর বটগাছের ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে সবসময় বিপদ থেকে আগলানোর জন্য!"

বীরেনের চোখ জলে ভরে আসে। কিছু মুহূর্ত চুপ থেকে সে আবার বলতে শুরু করে, "সবই ঠিক চলছিল কিন্তু ভগবান বুঝি বেছে বেছে ভালো মানুষগুলোকেই চরম দুর্যোগ দিয়ে থাকেন। সেদিনও তাই হল। সেইদিন আমার বেরোতে একটু দেরিই হয়েছিল, ঠাকুরমশাই সেদিন আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের ওই পুরোনো পুকুর ঘাটের ওদিক থেকে যে রাস্তা চলে গেছে সেইদিক থেকেই আমরা যেতাম। আমি ভেবেছিলাম ওই পথই ধরি, রাস্তায় হয়তো দেখা পেয়ে যাব ঠাকুরমশাইয়ের। হায় সেদিন যদি আমি একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম!" এই বলেই বীরেন হো হো করে কাঁদতে শুরু করে।

এই অবস্থায় বীরেনকে পরের ঘটনা বলতে বলার সাহস নীলের হয় না। তীর্থ উশখুশ করতে থাকে।

এরপরে হঠাৎই শিবেন বলতে শুরু করে, "এরপরের ঘটনা আমি বলছি। অভ্যেস মতো হাঁটতে বেরিয়েছিলেন সেদিন যোগেন্দ্রনাথ। পথে পুকুরঘাটের কাছে তিনি গ্রামেরই একটি মহিলাকে দেখতে পান পুকুরে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সারতে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই ওখান দিয়ে হেঁটে সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে যান। বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দেয় কিছু একটা খারাপ ঘটছে। ওঁর মধ্যে এই অদ্ভুত ক্ষমতাটা ছিল। উনি দূর থেকেই খারাপ কিছু ঘটার আভাস পেয়ে যেতেন। তিনি চোখ বন্ধ করে তার ক্ষমতার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেন আর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছুক্ষণ আগে পুকুরঘাটে দেখা সেই মহিলার মুখ। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পুকুরঘাটের দিকে ছুটে যান। তার পৌঁছাতে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল, তিনি যতক্ষণে গিয়ে পৌঁছালেন ততক্ষণে মেয়েটার যা সর্বনাশ ঘটার তা হয়ে গেছে। বেশ কিছু ছেলেকে অর্ধনগ্ন মেয়েটার সামনে অট্টহাস্য করতে দেখে তিনি সমস্তটা বুঝে যান। তখনই ছুটে যান সেইদিকে। তাকে

এগিয়ে আসতে দেখে সেই ছেলেগুলো ওখান থেকে চম্পট দেয়। ঠাকুরমশাই এসে অচৈতন্য মেয়েটার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। সেই মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে পাগলের মতো করতে শুরু করে। যোগেন্দ্রনাথের পক্ষে তাকে সামলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে সেই ছেলেগুলো গ্রামের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে সেই পুকুরঘাটে নিয়ে আসে। গ্রামের মানুষেরা যোগেন্দ্রনাথকে ওইরকম অবস্থায় মেয়েটার পাশে দেখে সেই ছেলেগুলোর কথাই বিশ্বাস করে নেয়। তীব্রভাবে অপমান করতে শুরু করে সবাই মিলে তাকে। কেউ কেউ তো গায়ে অবধি হাত তোলে। যোগেন্দ্রনাথকে কোনো কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি একটা চরম ভুল করে বসে। সবার অলক্ষ্যে সে নিজেকে ওই পুকুরের জলে আত্মবলিদান দেয়। এতে গ্রামের মানুষ আরও চোটে যায়। তাকে অপমান করে গ্রামের বাইরে বার করে দেওয়া হয়!"

এতটা বলে শিবেন থামলেই বীরেন বলে, "হ্যাঁ ওঁকে গ্রামের বাইরে বার করে দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু দুদিন পর উনি ফিরে আসেন তার স্ত্রী পাঞ্চালীকে নিয়ে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার জন্য। আমার সাথে ওঁর দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার স্ত্রীকে ভীষণই ভালোবাসেন, তাই কখনওই স্বার্থপরের মতো তাকে একা এই গ্রামে ছেড়ে চলে যাবেন না। ততদিনে পাঞ্চালীকে গ্রামের সবাই একঘরে করে দিয়েছে। দুদিন ধরে ঠিক মতো খেতে না পেয়ে, ঘরে বন্দি হয়েই ছিল। কিন্তু ঠাকুরমশাই যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছান তিনি গিয়ে পাঞ্চালীকে দুইজন পুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আবিষ্কার করেন। এই চরম ধাক্কাটাই তিনি আর সামলাতে পারেন না। সেখান থেকে ছুটে চলে যান নদীর ধারের বটতলায় আর তারপর সেখানেই ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন!"

"আর এরপরেই খুব অদ্ভুতভাবে পাঞ্চালীকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই তো?" শিবেন জিজ্ঞেস করে বীরেনকে। বীরেন কথার সম্মতি জানিয়ে ওপরে নীচে মাথা দোলায়। নীল আর তীর্থ দমবন্ধ করে শুনছিল সমস্ত ঘটনাটা। সমস্তটা শুনে নীল শিবেনকে বলল, "আপনি এতকিছু জানলেন কী করে?"

শিবেন হালকা হেসে বলে, "সবই তোমাদের দুপুরে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার ফল!"

"সবই তো বুঝলাম কিন্তু বাউডিহির অবস্থার সাথে এর সম্পর্ক কী?" উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করে বীরেন।

"সম্পর্ক তো একটা আছে দাদা না হলে সাধনায় আমি কিছুতেই ওঁর মুখ দেখতাম না। আমার সন্দেহ যদি ঠিক হয় তবে এই গ্রামে শুধু এই দুটো পাপ না তার সাথে আরও একটা

পাপ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে!"

"কী বলছিস কী শিবু, কীসের পাপ?"

শিবেন সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় বীরেনের দিকে, "যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পাঞ্চালী কোথায় গেল তা একবারও খোঁজ নিয়ে দেখলে না? জানার চেষ্টা করলে না যে জিনিসটা তোমরা চোখের সামনে দেখেছ সেটা আদৌ সত্যি কিনা? তোমাদের কারোর মনে হয়নি একবার যাচাই করে দেখা উচিত ছিল!"

শিবেনের কথা শুনে বীরেন বেশ খানিকটা অবাক হয়। কী বলতে চাইছে শিবেন? তবে কি তাদের আরও বড়ো কোনো ভুল হয়ে গেল? প্রশ্নটা ক্রমশই বীরেনকে ভাবাতে লাগল।

এর মাঝে হঠাৎই তীর্থ একটা অদ্ভুত কথা বলে ওঠে, "আচ্ছা তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছ এই পিশাচ কিন্তু কখনওই সকালে বা সূর্যের আলো থাকাকালীন মানুষের কোনো ক্ষতি করে না!" সবাই একটু অবাক হয় কিন্তু সবাই তীর্থের কথায় সম্মতি জানায়।

নীল প্রশ্ন করে, "আচ্ছা এমনটা যদি হয় তাহলে সকালে সেই পিশাচ থাকে কোথায়?"

এই কথাটা কিন্তু এতদিন কেউ ভেবে দেখেনি। এবারে সত্যিই বীরেন আর কমলার মুখে চিন্তার ছাপ দেখা গেল। শিবেন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা এই মৃত্যুগুলো ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল বলো তো?"

কমলা একটু ভেবে উত্তর দেয়, "ঠাকুরমশাই মারা যাওয়ার ওই দু-তিনদিন পর থেকেই।"

শিবেন জিজ্ঞেস করে, "এর মধ্যে কেউ উধাও হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে? এ যাবৎ যারা মারা গেছে তাদের সবারই মৃতদেহ তো তোমরা দেখেছ, তাহলে এমনকি কেউ আছে?

বীরেন বা কমলা এমন কাউকেই মনে করতে পারল না। কিন্তু কমলা মনে মনে কী যেন একটা ভাবতে লাগল। "আচ্ছা ঠাকুরমশাই মারা যাওয়ার পর হঠাৎই দুদিনের জন্য রাকার মা উধাও হয়ে গিয়েছিল না? আর তারপরে হঠাৎই ফিরে আসে। কেমন যেন বদলে গিয়েছিল সে। অদ্ভুত তার আচরণ। তাকে দেখে যেন কোনো অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।" কিন্তু সেই কথা কমলা কাউকেই বলেনি। "এর সাথে কি রাকার মায়ের কোনো সম্পর্ক আদৌ আছে? একবার কি বলব শিবেন কে?" মনে মনে ভাবতে থাকে কমলা। শিবেন তা লক্ষ করে কমলাকে জিজ্ঞেস করে, সে কিছু বলতে চায় কিনা?

কমলা সমস্ত কথা খুলে বলে শিবেনকে। সমস্তটা শুনে শিবেনের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়।

// ১৮ //

“যাক গিয়ে রাত হচ্ছে তোমরা সবাই খেয়ে নাও!” বীরেন সবাইকে উদ্দেশ করে বলে কথাটা। শিবেন কিন্তু কিছু খায় না। সে কিছুক্ষণ একা থাকতে চায় বলে ঘরে গিয়ে দোর দেয়। সবাই ভাবে সে নিশ্চয়ই সেই পিশাচকে শেষ করার কোনো ফন্দি করছে। তাই এই সময় তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

তাই নীল, তীর্থ, বীরেন একসাথে খেতে বসে যায়। এর মাঝে কখন যে শিবেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় তা তারাও বুঝতেও পারে না।

কমলার থেকে রাকাদের বাড়ির ঠিকানা আগেই জোগাড় করে নিয়েছিল সে। খুব একটা বেশি দূরে নয়। এই রাস্তাটা ধরে কিছুটা এগোলেই ডানদিকে কিছুটা গেলেই একটা মাঠ। মাঠের শেষের বাড়িটাই রাকাদের। মহিলা একাই থাকে। স্বামী মারা গেছে অনেকদিন আগে। মেয়ে রাকারও বিয়ে হয়ে গেছে। মহিলা কোথায় দিনমজুরীর কাজ করে। কারোর সাথেই খুব একটা মেশেন না। ওই যা একটু কমলার সাথেই কথা হতো। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ তার আচার-আচরণ যেন পুরো বদলে গেছে। যেন আলাদা একটা মানুষ, শুধু তার মুখটাই রাকার মায়ের মতো। এখানেই শিবেনের সন্দেহ। রাতারাতি কোনো মানুষ এতটা বদলে যেতে পারে না। তার সন্দেহ যদি ঠিক হয় তাহলে ওই পিশাচের সাথে রাকার মায়ের কোনো সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা এমন নয় তো এই পিশাচ তার দেহ আশ্রয় করেই লুকিয়ে আছে? হয়তো আসল মানুষটা অনেক আগেই মারা গেছে! শিবেনের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। এত বছর ধরে সে এত সাধনা করেছে। যে-কোনো ভূত পিশাচ তার হাতের তালুর মতো চেনা। কিন্তু সে তার সাধনা জীবনে এরকম কোনো পিশাচের অস্তিত্ব আছে বলে কোনোদিন জানতে পারেনি। ভারি আশ্চর্য এর ক্ষমতা আর তেমনই ধূর্ত, নাহলে এতদিন ধরে সে এখানে লুকিয়ে রয়েছে আর কেউ একবারও টের পায়নি। আজ যদি তীর্থ কথাটা না তুলত তাহলে তো তার মাথায়ও কথাটা আসত না।

ভাবতে ভাবতে শিবেন সেই বাড়ির সামনে এসে পড়ে। বাড়ির দশা দেখে শিবেন অবাক হয়ে যায়। এ তো পুরোই ভূতের বাড়ির দশা হয়েছে। পুরো বাড়িটাই অন্ধকারে ডুবে আছে। কয়েক মাস যে এই বাড়িতে কোনো মানুষের আনাগোনা হয়নি তা স্পষ্ট। এখানে সেই পিশাচের লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। শিবেন এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। একটু

জোড়ে চাপ দিতেই দরজাটা ক্যাচ করে একটা বিদঘুটে আওয়াজ তুলেই খুলে যায়। ভ্যাপসা বাতাসে ঘিরে আছে ঘরের ভেতরের আবহাওয়া। ভেতরে কিন্তু অজাগতিক কিছুর থাকার অস্তিত্ব শিবেন টের পায় না। আরও কিছুক্ষণ ঘরের এদিক ওদিক ভালো করে লক্ষ করে বাইরে বেরিয়ে আসে শিবেন। দু পা এগোতেই এবারে তার পায়ের একদম সামনে ওপর থেকে কেউ যেন ভারী কিছু ছুঁড়ে ফেলে। প্রথমটায় কিছুটা চমকেই যায় শিবেন। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই চাঁদের আলোয় যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করে। একটা মৃতদেহ, একটা মহিলার মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার পায়ের সামনে। শিবেন হাঁটু মুড়ে বসে মহিলার মৃতদেহটা সামনের দিকে ঘোরায়। শিবেন রাকার মা-কে কখনও দেখেনি কিন্তু তার বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না যে এই সেই মহিলা। এঁর মৃত্যু ছয় মাস আগেই হয়ে গেছে কিন্তু মৃতদেহতে কোনো পচন ধরেনি। সেটাই স্বাভাবিক। মৃতদেহ নষ্ট হয়ে গেলে সেই পিশাচ নিজেকে লুকিয়ে রাখবেই বা কোথায়? সে তো মনুষ্য সমাজে মানুষের শরীর আশ্রয় করেই লুকিয়ে ছিল এতদিন, তাহলেই তো মানুষের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল থাকতে পারবে।

এবারে একটা অদ্ভুত হাড় হিম করা জান্তব হাসির আওয়াজে পিছন ফিরে তাকায় শিবেন। মাটি থেকে কয়েক হাত উপরে ভেসে রয়েছে একপ্রস্ত অন্ধকারে মাখা সেই পিশাচ। তার বিকট হাসিতে তাচ্ছিল্যের সুর উপস্থিত। এবারে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে শিবেনের দিকে। কিন্তু শিবেনের দু হাত দূরত্বের মধ্যে এসেই সেই পিশাচ পাঁচ হাত দূরে ছিটকে যায়। ব্যাপারটায় যে সেই পিশাচ বেশ অবাক হয়েছে তা শিবেনের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে সাধনার মাধ্যমে যে সমস্ত শক্তি অর্জন করেছে এ তার মধ্যে অন্যতম। কোনো প্রেত পিশাচ সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না। এ ব্যাপারে যদিও সেই পিশাচ অবগত নয়। সে ক্রোধের আগুনে ফুটছে। হয়তো ক্ষমতা থাকলে সে এখনই শিবেনকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলত। সে পুনরায় তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে আসতে থাকে কিন্তু এবারে শিবেনও প্রবল মন্ত্রোবলে তার ত্রিশূলটা সেইদিকে ছুঁড়ে মারেন। সেই ত্রিশূল থেকে এক আগুনের হলকা সৃষ্টি হয় এবং যে মুহূর্তে সেটা সেই পিশাচের গায়ে গিয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে তার কালো শরীর। বিকট আওয়াজে চিৎকার করে ওঠে সেই নরপিশাচ। কিন্তু শিবেন ভালো মতোই জানে এর মাধ্যমে কিছুদিনের জন্য এই পিশাচের শক্তিক্ষয় করা গেল কিন্তু এতে ওর বিনাশ নেই। যেটুকু সময় সে পেল তাতে আরও শক্তি সঞ্চয় করে সে ফিরে আসবে আর তার আগেই শিবেনকে এই

পিশাচকে বিনাশ করার উপায় খুঁজে পেতেই হবে। এতে একমাত্র সাহায্য যে করতে পারে তা হল শিবেনের গুরুদেব, ভৈরব বাবা।

সেই পিশাচ শিবেনের শক্তির সামনে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। অচিরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। শিবেন মহিলাটির মৃতদেহটিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন এই গ্রামের সীমানায় অবস্থিত নির্জন শ্মশানটায়। তারপর কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করে শিবেন সেই মৃতদেহটাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল দেহটি।

****

শ্মশানের এক নীরব স্থানে বসে একমনে ধ্যান করে যাচ্ছে শিবেন। সামনে তার হোম যজ্ঞের আগুন লকলকে শিখায় দুলছে। দূর থেকে শেয়াল ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। মৃদু মৃদু ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। এই শ্মশানটা এতটাই নিস্তব্ধ যেন মনে হচ্ছে এ অন্য কোনো জগৎ।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা গম্ভীর গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করে এবারে থামে শিবেন। সামনের যজ্ঞের আগুনে একটা অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কারোর অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাতে। তার উপস্থিতির আভাস পেয়েই এবারে চোখ খোলে শিবেন। হাত জড়ো করে ভক্তিভরে প্রণাম করে সে।

সেই অবয়ব থেকে এবারে দৃঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"বলো শিবশঙ্কর কী জানতে চাও? তোমার মন এত উতলা কেন?"

"গুরুদেব! আমি এক মহান সমস্যায় উপনীত হয়েছি, আমি কিছুতেই এই সমস্যা থেকে উদ্ধারের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আমার সাধনা জীবনে এরকম কোনো ধূর্ত পিশাচের সম্মুখীন কখনও হয়নি। আমার কি সাধনা তবে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল? কী এই পিশাচের উৎস? এর ক্ষমতাই বা কতদূর? আর কীভাবেই বা এর বিনাশ সম্ভব? কিছুই যে বুঝছি না গুরুদেব!"

সামনের অবয়বটি এবারে একটু হালকা হেসে ওঠে তারপর বলে, "শান্ত হও শিবশঙ্কর। মাথা ঠান্ডা করে সমস্তটা ভাবো, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার চোখের সামনেই আছে। তবে আমি তোমায় একটা সাহায্য করতে পারি। তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পাবে শক্তিগড়ে গেলেই!"

"শক্তিগড়!" অস্ফুটে উচ্চারণ করে শিবেন। "ধন্যবাদ গুরুদেব! আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন যাতে এই নরপিশাচকে শেষ করে আপনার দেওয়া শিক্ষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে

পারি।”

অবয়বটি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলে, “সফল হও!”

এরপর সাথে সাথেই সেই অবয়ব অদৃশ্য হয় এবং আগের মতোই যজ্ঞের আগুন শান্ত হয়ে আসে।

এবারে শিবেন কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে, ধীরে ধীরে পা বাড়ায় বাড়ির দিকে।

ওইদিকে ঘরের ভেতরে শিবেনকে না দেখে বীরেন সহ বাড়ির সকলকে দুশ্চিন্তা হ্রাস করে। কিছুক্ষণ উশখুশ করতে করতে বীরেন এবারে যখন বাইরের দিকে পা বাড়াতে যাবে ঠিক এমন সময় শিবেন বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে ধরে প্রাণ আসে বীরেনের।

শিবেন কাছে এসে দাঁড়াতেই বীরেন সেই ছোটোবেলার মতো শিবেনকে শাসন করতে থাকে। দাদার কাণ্ড দেখে শিবেন হেসে ফেলে, “দাদা আমি আর তোর সেই ছোটো শিবু নই। এইসব প্রেত পিশাচ আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত পারবে না!”

“সে তুই যত বড়োই হয়ে যাস না কেন, তাই বলে হুট করে বেরিয়ে যাবি? বাড়ির কাউকে তো কিছু বলে যাবি! আমাদের তো চিন্তা হয় নাকি? সেই ছোটোবেলার মতো একই রয়ে গেলি! একটুও বদলালি না!”

শিবেন আবার হেসে ফেলে।

নীল জিজ্ঞেস করে, “তা তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?”

শিবেন রাকার মায়ের বাড়িতে যাওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনাটা তাদের খুলে বলে। সমস্তটা শুনে কমলা হতবাক হয়ে যায়। এর মানে ও এতদিন যাকে দেখে এসেছে, যার সাথে কথা বলেছে সে আদতে রাকার মা ছিলই না? রাকার মায়ের আড়ালে সেই পিশাচ ছিল? কমলার সারা শরীর কেঁপে ওঠে।

তীর্থ জিজ্ঞেস করে, “এবার কী করণীয় আমাদের?”

শিবেন শান্ত হয়ে বলে, “আমাদের কালই শক্তিগড়ের দিকে রওনা দিতে হবে। এই পিশাচকে বিনাশ করার উপায় ওখানেই লুকিয়ে আছে!”

কমলা ভয়ে ভয়ে বলে, “আর তোমার না থাকার সুযোগে যদি সেই পিশাচ...”

শিবেন অভয় প্রদান করে বলে, “তা নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। আমি আমার শক্তির দ্বারা কিছুদিনের জন্য ওই পিশাচকে রোধ করে রাখতে পারব! কিছুদিন ওই পিশাচ গা ঢাকা দিয়েই থাকবে!”

বীরেন কিছু একটা ভাবছিল। শিবেন তা দেখে জিজ্ঞেস করে, "দাদা কী ভাবছো? তুমি যাবে তো?"

বীরেন একটু ভেবে বলে, "শক্তিগড়! এই নামটা কোথায় যেন আমি শুনেছি! ইম... কিছুতেই মনে পড়ছে না! কোথায়... কোথায়... হ্যাঁ... হ্যাঁ... মনে পড়েছে। ঠাকুরমশাই... হ্যাঁ হ্যাঁ ঠাকুরমশাই তো শক্তিগড়েই থাকতেন! উনি নিজে আমাকে বলেছিলেন!"

শিবেন অবাক হয়ে যায়, "কী! যোগেন্দ্রনাথ?"

বীরেন নীরবে ওপরে নীচে মাথা দোলায়।

****

ভোর হওয়ার সাথে সাথেই শিবেন তৈরি হয়ে নেয় শক্তিগড় যাওয়ার জন্য। বীরেন যেতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে এক্ষুনি একবার স্টেশনে যেতে হবে। নীল আর তীর্থকে শিবেন সাথে নিতে চায়নি। কিন্তু তীর্থ এমন জোড়াজুড়ি শুরু করল যে শেষ অবধি রাজি হতেই হয় শিবেনকে। সকলে মিলে বাড়ি থেকে বেরোতে যাবে ঠিক তখনই বাড়ির এক নির্দিষ্ট দিকে শিবেনের নজর পড়ে। কিছু যেন ওখানে সূর্যের আলো পড়ে চকচক করে উঠল। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে শিবেন। একটা অদ্ভুত দেখতে ত্রিশূল। এই ত্রিশূল শিবেনের বিলক্ষণ চেনা। এর জন্যই সেই পিশাচ এই বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেও ঢুকতে পারেনি। এই একইরকম ত্রিশূল তার কাছেও রয়েছে। এই ত্রিশূল তাকে দিয়েছিল তার গুরুদেব, ভৈরব বাবা। তবে কি ভৈরব বাবা যোগেন্দ্রকে চিনত? তবে গুরুদেব তাকে কিছু বলল না কেন?

সকাল সকাল রওনা হলেও বেশ কিছুক্ষণ লাগবে শক্তিগড়ে পৌঁছাতে। কিছুটা হেঁটে গিয়েই ভ্যানে উঠবে তারা।

"আচ্ছা আপনার এই সাধনা জীবনে আসাটা কীভাবে হল?" বেশ একটা কৌতূহল নিয়েই প্রশ্নটা করে তীর্থ।

শিবেন মাথা নীচু রেখেই হাঁটছিল। এবারে সে মুখ তোলে এবং বলে, "সে তো অনেক বছর আগের কথা। বাবা তো কবেই মরে গিয়েছিল আর তার কয়েক বছর পর মা-ও চলে গিয়েছিল। বাড়িতে মোটে মন টিকত না। সারাদিন শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াতাম, সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে সময় কাটাতাম। পড়াশোনাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই নিয়ে বিস্তর ঝামেলা হতো দাদার সাথে। একদিন রাগের মাথায় আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল। তখন কতই বা বয়স আমার, ১৮/১৯ হবে। আমিও রাগ দেখিয়ে সেদিনই গ্রাম ছাড়লাম। তারপর দীর্ঘদিন পথেঘাটে ঘুরে, এখানে ওখানে ছোটোখাটো কাজ করে দিন গুজরান করেছি। শেষ যে

দোকানে কাজ করেছিলাম সেই দোকানের মালিক আমাকে একবার কাশী নিয়ে যায়। ওখানে আবার আমি সাধু সন্ন্যাসী, তাদের তন্ত্র সাধনা এইসবের প্রতি আকৃষ্ট হই। ব্যস তারপর যা হওয়ার তাই হল। সেই মালিকের হাত থেকে পালিয়ে আমিও সাধু সন্ন্যাসীদের ভীড়ে গিয়ে পড়লাম। আজ এই সন্ন্যাসী কাল সেই সন্ন্যাসী, সবার কাছ থেকে নানান তন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলাম। কিন্তু আমি যেন কিছুতেই প্রসন্ন হতে পারছিলাম না। তাই পারি দিলাম আরও দূরে। আর তারপরেই খোঁজ পেলাম ভৈরব বাবার!"

নীল জিজ্ঞেস করল, "মানে আপনার গুরুদেব?"

শিবেন ওপরে নীচে মাথা দোলাল। "ওঁর হাত ধরেই আমি তন্ত্রবিদ্যার জগতে পদার্পণ করলাম। এখন তোমাদের সামনে যে শিবশঙ্করকে দেখছ, এই নামকরণ আমার গুরুদেবের শেখানো তন্ত্রবিদ্যার জোড়েই পাওয়া! মহাদেবের বিশেষ বরপ্রাপ্ত আমি, বুঝলে!"

নীল আর তীর্থ অবাক হয়ে তার সমস্ত কাহিনি শুনল। তীর্থ কিছু বলতেই যেত কিন্তু তার আগেই ভ্যান দেখতে পেয়ে শিবেন সেইদিকে ছুটে গেল। নীল আর তীর্থও শিবেনকে অনুসরণ করল।

ভ্যান এখন চলতে শুরু করেছে। তীর্থ আবার শিবেনকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা শক্তিগড় তো শুনেছি বেশ বড়ো গ্রাম। ওখানে গিয়ে আমরা কীভাবে সেই পিশাচকে শেষ করার উপায় খুঁজে পাব?"

"খোঁজা হয়তো কঠিন কিন্তু অসম্ভব তো নয়। আমাদের আগেই গ্রামে গিয়ে যোগেন্দ্রনাথের সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। আমার বিশ্বাস উনি কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। আমার অনুমান যদি সঠিক হয় তাহলে এই পিশাচ যোগেন্দ্রনাথ আর পাঞ্চালীকে মারতেই এসেছিল। ওদেরকে অনুসরণ করেই সে বাউডিহি গ্রামে পৌঁছেছিল। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কে এই পিশাচকে আহ্বান করেছে! একমাত্র সেই পারবে এই পিশাচকে পুনরায় নরকে পাঠাতে!"

নীল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সে কি? তাহলে ওই প্রেত যদি যোগেন্দ্রনাথকেই মারতে আসত তাহলে সে তাকে কিছু না করে গ্রামের লোকগুলোকে মারছে কেন?"

শিবেন গম্ভীর স্বর বলল, "বললাম না, উনি কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। উনি জন্মাবস্থাতেই ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হয়তো উনি বাউডিহিতে এসেছিলেন সাধনা করার জন্য। বাউডিহির কালভৈরবী মন্দির সংলগ্ন স্থানটি একটা আদর্শ সাধন ক্ষেত্র। হয়তো ওঁর কাছে সেই সময় সেই পিশাচকে দমন করার কোনো ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু উনি ওঁর

ক্ষমতার দ্বারা তাকে আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর দীর্ঘদিন এইরকম বন্দি অবস্থায় থাকার জন্য সেই পিশাচের খিদে ক্রমশই বাড়তে থাকে। যোগেন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার সাথে সাথেই তার দ্বারা তৈরি বন্ধনও কেটে যায়। আর তারপরেই শুরু হয় পিশাচের নারকীয় শিকার!"

তীর্থ বলল, "বুঝলাম কিন্তু আমার কাছে এখনও একটা জিনিস ধোঁয়াশা হয়ে আছে!"

শিবেন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাস্যু দৃষ্টিতে তীর্থের দিকে তাকায়।

তীর্থ সকৌতূহল জিজ্ঞেস করল, "আপনি বলেছিলেন যে বাউডিহি গ্রামে নাকি তিনটে বড়ো পাপ ঘটে গেছে আর তার ফলে বাউডিহির পবিত্র ভূমিও কলুষিত হয়েছে। একটা হল সেই মহিলার সাথে ঘটা পুকুরঘাটের ঘটনা আর একটা এই ঠাকুরমশাইয়ের ঘটনা আর একটা পাপ কী?"

শিবেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "সেই উত্তরও পেয়ে যাবে খুব শীঘ্রই আর তার উত্তর শক্তিগড়ে নয় বাউডিহিতেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য শক্তিগড়। এখন আর কোনো প্রশ্ন নয়। অনেকটা পথ যেতে হবে, বিশ্রামের প্রয়োজন। তোমরাও একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও!"

শিবেনের দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না তীর্থ। নীলের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে একবার ঢোক গেলে। না জানি আর কী কী ভয়ানক ঘটনা তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে!

// ১৯ //

"আচ্ছা দাদা এখানে যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জির বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারবেন?" অচেনা গলার আওয়াজে চায়ের দোকানের লোকটি আর বেঞ্চে বসে থাকা দুজন ব্যক্তি বেশ খানিকটা অবাক হল।

বেঞ্চে বসে থাকা একজন ব্যক্তি তাদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "আপনারা কি এই গ্রামে নতুন?"

নীল স্মিত হেসে বলল, "হ্যাঁ আজই এলাম এখানে!"

চায়ের দোকানের ব্যক্তি বললেন, "তা আপনারা যোগেনকে খুঁজছেন যে সে তো আর এখানে থাকে না। অনেক মাস আগেই অন্য গ্রামে চলে গেছে!"

শিবেন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ সে জানি। আমরা বলতে চাইছি যে যোগেন্দ্রনাথের বাড়ি বা ওর পরিবারের কোনো লোক এখানে থাকে কিনা?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, "হ্যাঁ সে তো আছে! কিন্তু আপনারা হঠাৎ যোগেনের বাড়ি খুঁজছেন?"

লোকগুলো যে কিছু লোকাচ্ছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল শিবেন। কিছু যেন তারা বলেও বলছে না।

চায়ের দোকানের ব্যক্তি বললেন, "ওর বাড়ি যেতে হলে তো এখান দিয়ে আরও বেশ খানিকটা যেতে হবে। এখন তো রাত হয়ে গেছে অনেকটা। ওইদিকে তো আবার জঙ্গলও পড়ে!"

এবারে সত্যিই নীল, তীর্থ ধন্দে পড়ে। শিবেনের কাছে এ নয় কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু ওদের কাছে এতটা হেঁটে এসে আবার জঙ্গল হেঁটে পার করা প্রায় অসম্ভব। ওদের অবস্থাটা বুঝতে পেরে শিবেন চায়ের দোকানের লোকটিকে বলে, "আচ্ছা আজ রাতটা থাকার জন্য একটু কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে কি? আমাকে নিয়ে চিন্তা নেই। শুধু ওদের দুজনের থাকার জন্যই!"

নীল এবারে শিবেনের কথায় বেশ জোড়েই বলল, "শুধু আমাদের জন্য মানে? তুমি থাকবে কোথায়? থাকলে একসাথেই থাকব!"

শিবেন আশ্বস্ত করে বলতে গেল, "আরে আমার এইসবের অভ্যেস আছে..."

চায়ের দোকানের ব্যক্তি বললেন, "আছে তো, আমার বাড়িই আছে তো। আপনারা আজকের রাতটা না হয় ওখানেই থেকে যান। আমি একাই থাকি!"

তীর্থ উৎফুল্লিত হয়ে বলল, "বাহ এই তো আজ রাতের থাকার ব্যবস্থাটাও হয়ে গেল। চল এবারে একটু গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দেব!" এই বলে আড়মোড়া ভাঙতে যায় তীর্থ কিন্তু নীলের একটা গুঁতো খেয়েই, "উরি বাবা!" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। নীলের চোখ পাকানো দেখে তীর্থ জিভ কাটে।

চায়ের দোকানের ব্যক্তি হেসে বলে, "হে হে। ও ঠিক আছে। আমার বাড়িতে রান্নাবান্না সব করা আছে। গিয়ে হাত পা ধুয়ে নিয়ে লম্বা ঘুম দিওখন! দাঁড়াও দোকানটা বন্ধ করে নিই!"

তীর্থ বলল, "কাকু তোমার নামটাই তো জানা হল না!"

চায়ের দোকানের ব্যক্তি বললেন, "আমার নাম? বীরু কাকু বলেই ডেকোখন!"

****

তীর্থ বলল, "আহহহ! ঠান্ডা জলটা দিতেই শরীরের সাথে সাথে মনটাও চাংগা হয়ে গেল একেবারে!"

বীরু হেসে বলল, "হে হে নাও এবারে গরম গরম চা খাও তো দেখি!"

তীর্থ আনন্দে বলল, "আহহ! প্রাণটা জুড়িয়ে গেল! এই চাটা খুব দরকার ছিল!"

এবারে বীরু তাদের জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তোমরা যোগেন্দ্রকে খুঁজছ কেন তা তো জানাই হল না! কতগুলো দিন হয়ে গেল ছেলেটাকে দেখিনি!"

নীল বলল, "তোমাদের বুঝি রোজ দেখা হতো?"

"হ্যাঁ, সে রোজ আসত আমার দোকানে চা খেতে। সবার খোঁজখবর নিত সে। ভারি ভালো ছেলে ছিল! শুধু একটাই আক্ষেপ, ছেলেটা বাবা মায়ের ভালোবাসাই আর পেল না গো!"

তীর্থ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, "ব্যাপারটা একটু খুলে বলো তো কাকু!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সে বলছি, কিন্তু তুমি তো কিছুই নিলে না। শুধু মুড়ি খাচ্ছ!"

শিবেন বলে উঠল, "না না আমি ঠিক আছি, আপনি বলুন!"

"বেশ তবে বলি শোনো!"

যোগেন্দ্র কোনো সাধারণ ছেলে ছিল না। এক বিশেষ দিনে ওর জন্ম হয়েছিল। যোগেন্দ্র আসার পরেই আমাদের সবার জীবন যেন বদলে গিয়েছিল। আমার মনে আছে সেইবার সবার জমি ফসলে ভরে গিয়েছিল। ব্যাবসারও দারুণ উন্নতি হয়েছিল।

যোগেন্দ্রর মা প্রসন্নর অনেকটা বেশি বয়সেই বাচ্চা হয়েছিল। শুনেছিলাম প্রসন্ন কোন এক

সাধুবাবার আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল আর তার আশীর্বাদেই জন্ম হয়েছিল যোগেন্দ্র। উনি বলেই দিয়েছিলেন যে এ কোনো সাধারণ ছেলে হবে না। যোগেন্দ্রর যে দিব্য শক্তি আছে তা মনুষ্য জগতকে যে-কোনো অশুভ শক্তি থেকে বাঁচাতে সক্ষম। সময়ের সাথে সাথে ও নানান সাধনার মাধ্যমে আরও শক্তি সঞ্চয় করবে। হয়েছিলও তাই। খুব অদ্ভুত লাগলেও এটা সত্যি যে গ্রামের মানুষের যা বিপদই হোক না কেন যোগেন্দ্র কিন্তু প্রত্যেককে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করত। গ্রামের মানুষ ওকে একদম মাথায় করে রাখত! ঈশ্বরের থেকে কম সম্মান ওকে করা হতো না। বুঝলে!"

নীল বলল, "বাহ তাহলে তো বলতে হয় যোগেন্দ্রনাথ আপনাদের চোখের মণি ছিলেন!"

"ঠিক বলেছ, ঠিক তাই। কিন্তু বেছে বেছে ভালো মানুষগুলোর কপালেই ভগবান খারাপ কিছু লিখে রাখবেই!"

তীর্থ জিজ্ঞেস করল, "কীরকম?"

"যোগেন্দ্রর বাপ ছিল একেবারে ওই যাচ্ছেতাই। খালি মদ গিলে আসত আর প্রসন্নর ওপর অত্যাচার করত। আমরা পাড়ার লোকেরা মিলে কতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু ও শুধরায়নি। একদিন তো এমন কাজ করল যে তার জন্য প্রসন্নটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল!"

এবার শিবেন প্রশ্ন করল, "কী করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথের বাবা?"

"একদিন হঠাৎ কোথা থেকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে এল প্রসন্নর সতীনকে! যোগেন্দ্রর বয়স তখন সবে ৮ না ৯। দুদিন চরম অশান্তি হল। পাড়ার লোকেরা কিছু বলতে গেলেই সেই মহিলার কি যাচ্ছেতাই কথাবার্তা। একদম দজ্জাল প্রকৃতির ছিল ওই মহিলা। মহিলা বলে গায়ে হাত দিতেও কেউ পারছিল না আর কেউ ওর সাথে মুখ লাগাতেও চাইছিল না। কে আর যেচে অপমানিত হতে চায়? দুদিন চরম অশান্তি হওয়ার পর একদিন হঠাৎ প্রসন্ন বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল। তার পরেরদিন পুকুরে ভেসে উঠল প্রসন্নর ফুলে যাওয়া লাশ। ও আত্মহত্যা করেছিল কিনা সে নিয়ে আজও আমার সন্দেহ আছে, কী জানি হয়তো সেই মহিলাই প্রসন্নকে..."

নীল বলল, "হুম বুঝলাম। কিন্তু তারপর যোগেন্দ্রনাথের কী হল?"

"এই ঘটনার পর থেকে যোগেন্দ্রনাথের জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠল। উঠতে বসতে চলতে থাকলো সেই মহিলার মানসিক অত্যাচার। গায়ে হাত দিতে সাহস সে পেত না কারণ সে খুব ভালো মতোই জানত যোগেন্দ্রর গায়ে যদি একটা আঁচড়ও পড়ে তাহলে গ্রামের

মানুষেরা ওকে ছেড়ে দেবে না। তাই সেইদিক থেকে ও খুব সাবধানীই ছিল। এইভাবেই প্রায় একটা বছর কেটে গেল। যোগেন্দ্রর এরকম অবস্থা যখন তখন হঠাৎই একদিন আমাদের গ্রামে এক ভৈরব বাবার আবির্ভাব ঘটল। সে যোগেন্দ্রকে দেখেই বুঝলেন যে এ কোনো সাধারণ বাচ্চা নয়। তিনি যোগেন্দ্রকে নানান বিদ্যে দিতে শুরু করলেন। এই ভৈরব বাবা ছিলেন আমাদের এখানে যে পুরোনো কালীমন্দির আছে সেখানকার পুরোহিতের চেনা। ভৈরব বাবার পরামর্শেই ঠাকুরমশাই যোগেন্দ্রকে নিজের কাছে রাখা শুরু করলেন, একদম নিজের ছেলের মতো। মন্দিরে থাকতে থাকতে মন্দিরের কাজকর্মও সব শিখে নিল সে। এর মধ্যেই যোগেন্দ্রর বাবাও একদিন হঠাৎ করেই মারা যায়। ফলত ওই বাড়িতে আর পিছুটান যোগেন্দ্রর ছিল না। তাই সে-ও বাড়ি ছেড়ে চলে এল ঠাকুরমশাইয়ের কাছে। এই ঠাকুরমশাইয়ের এক মেয়েও ছিল, পাঞ্চালী। পরবর্তীকালে ওর সাথেই আমাদের যোগেন্দ্রর বিয়ে হয়।

ইতিমধ্যে যোগেন্দ্র ভৈরব বাবার থেকে বিদ্যে পেয়ে আরও নানান বিষয়ে পারদর্শী হতে শুরু করে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ওর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ওর আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে আরও মানুষ অবগত হয়।

ওইদিকে যোগেন্দ্রর এত নাম দেখে রাগে আর হিংসায় জ্বলতে থাকে যোগেন্দ্রর সৎ মা বিমলা। বিমলা তখন আট মাসের অন্তসত্ত্বা। আগেই বলেছি বিমলা ছিল দজ্জাল প্রকৃতির মহিলা আর তার ওপর তার রাগ একদম নাকের ডগায় লেগে থাকত। একদম বদরাগী যাকে বলে। একবার প্রতিবেশীর দুই ছেলে খেলতে খেলতে ভুল করে বল ছুঁড়ে মেরেছিল বিমলার সবেমাত্র ধুঁয়ে ঝোলানো সাদা শাড়িটায়। ব্যস কাদা লেগে সে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। এই দেখে বিমলার মাথায় চণ্ডাল ভর করল যেন। লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারতে লাগল বাচ্চা দুটোকে। হাত, পা, মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। কিন্তু তাও বিমলার থামার কোনো নাম নেই। এত মার খেয়ে ছোটো ছেলেটা অসুস্থ হয়ে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে গেল। বড়ো ছেলেটা কোনোভাবে বাড়িতে গিয়ে নিজের মাকে গিয়ে পুরো ঘটনাটা বলল। সব শুনে ছেলেটার মা ক্রোধের আগুনে ফেটে পড়ল। বিমলার বাড়িতে গিয়ে ছোটো ছেলেটাকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে মহিলাটি বিমলাকে ও তার আসন্ন বাচ্চাকে অভিশাপ দিয়ে বসল। শুনেছিলাম ওই মহিলা নাকি কীসব নিম্ন মার্গের সাধিকা ছিলেন। আমি ওইসব অত শত কিছু বুঝি না। সে যাক গিয়ে। বিমলা বুঝতে পারে ক্রোধের বশে এসে সে কী বড়ো ভুল করে ফেলেছে। সে ক্ষমা চায় ওই মহিলার কাছে কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এর প্রায় পাঁচদিনের মাথায় জন্ম নেয় বিমলার সন্তান। আট মাসেই! কিন্তু তার বাচ্চাকে

দেখে গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ ভয়ে শিউরে উঠল!”

নীল সকৌতূহল জিজ্ঞেস করল, “কেন কেন?”

“বিমলার সন্তানের শরীর তো সাধারণ মানুষের মতোই ছিল কিন্তু তার মাথা...”

তীর্থ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু তার মাথা কী?”

“সে একটা শরীরেই দুটো মাথা নিয়ে জন্মেছিল। একটা মানুষের মাথা আর একটা শয়তানের!”

বীরুর থেকে দুটো মাথাওয়ালা শিশুর জন্মানোর কথা শুনেই তীর্থর খটকা লাগল, সে শিবেনের দিকে তাকিয়ে দেখল তার কপালেও চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট। এইসময় নীল বলে, “বলেন কী? দুটো মাথা আর একটা শরীর!”

“হ্যাঁ। ততদিনে সেই সাধিকা তার সন্তানদের দিয়ে ওই জায়গা ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। এইদিকে বিমলার তো সেই সন্তানকে নিয়ে পাগল পাগল অবস্থা। একে তো বিমলাকে কেউ পছন্দ করত না তার ওপর তার ওই সন্তান। মানুষের মনে প্রথম থেকেই ওই সন্তানকে দেখে তীব্র ঘৃণা জন্মাল। বাচ্চাটা সত্যিই ভীষণ অদ্ভুত ছিল। আমিও নিজের চোখে দেখেছিলাম তাকে। তার বাম দিকের মুখটা মানুষের মতোই কিন্তু তার ডান পাশের মুখ একদম কুচকুচে কালো। দেখলেই হাত পা একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়। আমার তো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা হয়েছিল!”

নীল জিজ্ঞেস করল, “তা এরপর গ্রামের লোক কী করল?”

“গ্রামের লোক আর কীই বা করতে পারে। প্রথম প্রথম সবাই ওই বাচ্চাকে দেখে তাকে মেরে ফেলা হবে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হল। কিন্তু যতই হোক বিমলাও তো আর পাঁচজন মায়েদের মতোই একজন মা। সে নিজের সন্তানের যত খুঁতই থাকুক না কেন, ফেলে তো দিতে পারে না। তাই গ্রামের মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও সে কিছুতেই কাউকে তার বাচ্চাকে স্পর্শ করতে দিল না। দু-তিনবার চেষ্টা করেও সবাই হাল ছেড়ে দিল। কেই বা বারবার বিমলার ওই কুৎসিত বাক্যবাণের সম্মুখীন হতে চায়? কিন্তু এরপর থেকে বিমলা ও তার বাচ্চাকে একদম একঘরে করে রাখা হল। বাড়িতে থাকা খাবার একদিন ফুরিয়ে এল। বিমলা এর কাছে তার কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে শুরু করল কিন্তু ওর কোলে ওই বাচ্চাকে দেখেই ঘেন্নায় সবাই মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিত। এরপর একদিন হঠাৎই বিমলা আর ওর বাচ্চা উধাও হয়ে গেল। কেউ কেউ ওই গ্রামের শেষের দিকের ঘন জঙ্গলটাতে ওদের শেষবারের মতো দেখেছিল। দু-একবার কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করা হয় কিন্তু জঙ্গলের

ভেতরে ঢোকার সাহস আর কেউ দেখায়নি। তা ছাড়া বিমলার ওপর সবার একটা রাগ থাকার দরুণ ওই 'আপদ বিদেয় হয়েছে' এই ভেবেই সবাই আবার যে যার নিজের জীবনে ব্যস্ত হয়ে গেল!"

পুরোটা প্রথম দিয়ে শুনে শেষে আসল জায়গায় এসে অসম্পূর্ণ গল্পটা শুনে নীল আর তীর্থ দুজনেরই মুখ বাংলার পাঁচ হয়ে গেল। এইদিকে শিবেন কিন্তু শান্ত হয়ে কিছুতেই বসে থাকতে পারল না। তার কপালের ভাঁজ আরও সংকুচিত হল।

বীরু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, "হে হে শেষটা মনে হয় তোমরা এমনটা আশা করোনি? আসলে সত্যি বলতে কি কৌতূহলটা আমারও আছে যে শেষ অব্দি ওদের কী হল? কিন্তু কী আর করা যাবে যা নিজে থেকে হারিয়ে গেছে তাকে তো আর খুঁজে পাওয়া যায় না!"

শিবেন বলল, "হারিয়ে যায়নি বরং লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়েই সে আসল কাজটা করেছে। খুব বড়ো ভুল হয়ে গেছে আপনাদের। তখনই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলা উচিত ছিল আপনাদের!"

বীরু খানিকটা ভয় ভয় বলল, "কেন বাবা এরকম কেন বলছ? কিছু খারাপ ঘটেছে? যোগেন... যোগেন্দ্র কেমন আছে?"

বীরুর প্রশ্নে নীল আর তীর্থ দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শিবেন বাউডিহিতে ঘটা সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানায় বীরুকে। সমস্তটা শুনে বীরু মাথায় হাত দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। নীল আর তীর্থ দুজনে মিলে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।

শিবেন শান্ত স্বরে বলে, "আপনি শান্ত হন দেখুন এইভাবে কাঁদবেন না। আমরা বুঝতে পারছি যে যোগেন্দ্রনাথ আপনার সন্তানসম ছিলেন। কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, এখন আমাদের বাউডিহিকে সেই পিশাচের হাত রক্ষা করতে হবে। আচ্ছা আপনি কী বলতে পারবেন যে সেই সাধিকা মহিলা বিমলার বাচ্চাকে কী অভিশাপ দিয়েছিল?"

বীরু চোখের জল মুছে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে, "তা তো জানি না বাবা। তবে তুমি আমাদের কালীমন্দিরের ওই ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করতে পারো। যদি উনি কিছু জেনে থাকেন তো!"

শিবেন বলে, "আচ্ছা বেশ, এবারে আপনি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন!"

বীরু আর কিছু বলে না, নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে যায়। এইদিকে তীর্থ খুব ধীরে ধীরে বলে ওঠে, "আরে আমাদের রাতের খাওয়ারটার কথা তো বলাই হলো না ওঁকে!"

নীল কটমট চোখে তীর্থের দিকে চেয়ে বলে, “তোর লজ্জা করে না। এইসময়ও তোকে হ্যাংলামি করতে হয়?”

তীর্থ মুখ কাচুমাচু করে বলে, “কিন্তু আমার হেব্বি খিদে পেয়েছে ভাই!”

নীল বলে উঠল, “নে এটা খা। আমি জানতাম যে তোর রাহুর খিদে তাই বউদি আমাদের রান্না করেই দিয়েছিল পথে খাওয়ার জন্য। তখন তো আর খাওয়া হয়নি এখন খেয়ে নে তুই!”

তীর্থ জিজ্ঞেস করল, “তুই খাবি না তো?”

নীল বলে, “আমাকে দেখে কি তোর মানুষ মনে হয় না? আমার খিদে পায় না?”

নীল আর তীর্থের এই কথা কাটাকাটির মাঝে শিবেন নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। তারপর মাটিতে পাতা মাদুরে টানটান হয়ে একপাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পরে। শিবেনকে শুয়ে পড়তে দেখে নীল আর তীর্থও বেশি কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এসে শুয়ে পড়ে। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় খুব তাড়াতাড়িই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

// ২০ //

সকালে ঘুম ভাঙতেই তীর্থ দেখল ওর আশেপাশে কেউ নেই। তাকে ছেড়েই নীল আর শিবেন পিশাচ বধের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে গেছে এই আশঙ্কায় সে ধড়ফড় করে উঠে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে এসে দেখে নীল একটা চৌকির উপর বসে কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছে আর কিছুটা দূরে একটা গাছতলায় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে শিবেন। তাদের দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তীর্থ। বীরুও এইদিকে ওদের জন্য গরম গরম চা নিয়ে উপস্থিত হয়। তীর্থকে দেখে সে বলে, "আরে তীর্থ দাদাবাবু উঠে পড়েছ দেখছি। তুমি গিয়ে মুখ ধুয়ে নাও আমি তোমার চা-টা নিয়ে আসি বরং!" এই বলে সে আবার ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়। এতক্ষণে তীর্থ ওর রেডিয়াম ঘড়িতে সময়টা দেখে নেয়। সকাল ৯টা বেজে গেল! এতক্ষণ ও ঘুমিয়েছে? নীলের দিকে তাকিয়ে দেখল সে এখনও ফোনে কারোর সাথে কথা বলতে ব্যস্ত। তাই এই সুযোগে চটপট গিয়ে মুখ ধুয়ে নিয়ে, একটা বড়োসড়ো আড়মোড়া ভেঙে নীলের পাশে এসে বসল তীর্থ। শিবেন তখনও ধ্যানে মগ্ন। বীরু কাকাও এর মধ্যে চা নিয়ে হাজির। নীলও ততক্ষণে ফোন ছেড়ে চা পানে মনোনিবেশ করেছে। ইতিমধ্যে দু-তিনজন বীরু কাকাকে আজ দোকান না খোলার কারণ জিজ্ঞেস করতে আসলে বীরু তার শরীর খারাপ তাই আজ দোকান বন্ধ বলে তাদের ভাগিয়ে দেয়। আসলে শরীর খারাপটারাপ কিছুই নয় বীরু কাকার মন খারাপ। হওয়াটাই স্বাভাবিক, রক্তের সম্পর্কের কেউ না হলেও যোগেন্দ্রনাথ যে ওঁর খুব কাছের ছিলেন তা বোঝা যায়।

চা-এ বিস্কুটটা চুবিয়ে মুখে পুরেই তীর্থ নীলকে জিজ্ঞেস করে, "তা আমরা কখন যাব সেই ঠাকুরমশাইয়ের কাছে?" নীল চা-টা শেষ করে পাত্রে ভাঁড়টা রাখতে রাখতে বলে, "সে শিবেনদা দেখা করে এসেছে।" তীর্থ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে নীলের দিকে। "তোর বা আমার কারোরই এতটা পথশ্রমের অভ্যেস নেই তাই দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিলাম এবং স্বাভাবিকভাবেই সকালে আর ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু শিবেনদা তো এইসবে অভ্যস্ত। তাই সে ভোর ভোর উঠেই চলে গিয়েছিল মন্দিরে। আমি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন শিবেনদাকে দেখলাম ফিরে আসছে। যা বোঝার সব বুঝে গেলাম। শিবেনদাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম সে-ও একই কথা বলল। তারপর তো গাছতলায় গিয়ে ওই যে ধ্যানে বসল ব্যস আর তার ওঠার নাম নেই!"

“ঠাকুরমশাইয়ের সাথে কী কথা হল সেইসব কিছু বলল?” তীর্থ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

“আরে ওটা জানার জন্যই তো চাতক পাখির মতো চেয়ে বসে আছি!” নীল হতাশ হয়ে বলল।

তীর্থ নীলের কথা শুনে পুনরায় চায়ে চুমুক দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে পর শিবেন তার ধ্যান ছেড়ে উঠে আসে। তাকে উঠে আসতে দেখেই তীর্থ একেবারে জাপ্টে ধরে শিবেনকে।

“তুমি আমাদের না ডেকেই একা একা চলে গেলে?”

“আরেহ তোমরা ঘুমাচ্ছিলে তাই আর ডাকিনি! আর ওখানে তোমাদের তো কোনো কাজ ছিল না!”

শিবেনের কথায় তীর্থ আর কিছু না বলে ব্যাজার মুখ নিয়ে বসে থাকে। নীল হঠাৎ বলে ওঠে, “তুমি আগে বলো ঠাকুরমশাইকে পাঞ্চালীর কথা কিছু বললে?”

শিবেন একটা বড়োসড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “কী বলব? আমরা নিজেরাও তো জানি না যে পাঞ্চালী কোথায় গেল? কীই বা হল তার সাথে!”

নীল শিবেনের কথায় সায় জানায়।

নীল বলল, “তারপর বলো, ঠাকুরমশাইয়ের থেকে কী কী জানলে?”

শিবেন বলল, “খুব বেশি কিছু না! তবে যেটুকু জানলাম সেটা ভয়ানক!”

তীর্থ সকৌতূহল জিজ্ঞেস করল, “কী কী?”

শিবেন বলে, “যে মহিলাটি বিমলাকে অভিশাপ দিয়েছিল তিনি শয়তানের উপাসক ছিলেন। ওঁর অভিশাপেই বিমলার গর্ভে থাকা সন্তান শয়তানের কবলে পড়ে!”

তীর্থ অবাক হয়ে বলে, “কী বলছ! সাক্ষাৎ শয়তান!”

শিবেন বলে, “হুম! বিমলার একটি বাচ্চার শরীরে দুজনের অস্তিত্ব ছিল। একটা সেই বাচ্চার আত্মা আর একটা সাক্ষাৎ শয়তানের! সময়ের সাথে সাথে সেই শয়তান সম্পূর্ণ শরীরের দখল নিতে থাকে!”

বীরু ভয়ে বলে ওঠে, “ওওও! ওই কারণেই বাচ্চাটার শরীর দিন দিন কেমন কুচকুচে কালো হয়ে যাচ্ছিল ঠিক ওর ওই ডানদিকের মাথাটার মতো!”

শিবেন সম্মতি জানিয়ে বলল, “হুম ঠিক তাই। আচ্ছা আপনি কি একটু মনে করে বলতে পারবেন আপনাদের গ্রামে ভৈরব বাবার পরে আর কোনো তান্ত্রিক বা ওরকম কেউ কখনও

এসছিলেন কিনা?”

বীরুকে উদ্দেশ করে প্রশ্নটা করলে বীরু বেশ কিছুক্ষণ ধরে কী যেন একটা ভাবতে থাকে। যেন স্মৃতির পাতা ওলটাতে ওলটাতে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে সে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় সে বলে, “হ্যাঁ এসেছিল তো। এক অঘোরী তান্ত্রিক। কী ভয়ানক তার চেহারা! আজও সেই মুখ মনে পড়লে ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। উচ্চতায় প্রায় ৭ ফুট। সারা শরীর ছাই ভস্মে মাখামাখি। সবচেয়ে ভয়ানক ছিল তার চোখদুটো। টকটকে লাল চোখদুটো সবসময় যেন ভাটার মতো জ্বলত!” এই বলেই বীরু দু-হাত জড়ো করে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করল।

“কিন্তু কেন বলো তো? ওই বিমলার সাথে কি ওই অঘোরী তান্ত্রিকের কোনো যোগসূত্র ছিল?”

“যোগসূত্র তো ছিলই! ওঁর কারণেই তো এই পিশাচের জন্ম!” শিবেন বলে ওঠে।

নীল, তীর্থ, বীরু তিনজনেই একত্রে সবিস্ময়ে একে অপরের দিকে চেয়ে থাকে।

শিবেন বলে, “হিংসায় জ্বলতে থাকা বিমলা গ্রামবাসীদের নিদারুণ অবহেলা আর যোগেন্দ্রনাথের প্রতি সবার এত ভালোবাসা দেখে ক্রোধের আগুনে জ্বলতে থাকে, তাই প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহায় নিজের সন্তানকে শয়তানের পায়ে বলিদান করে! আর তাকে এই কাজে সাহায্য করে সেই অঘোরী সাধু। এবারে বুঝতে পারছ তো সেই বাউডিহির পিশাচের দুখানা মাথা কেন?”

নীল আর তীর্থ নিঃশব্দে মাথা দোলায়।

এইসময় হঠাৎ নীল একটা প্রশ্ন করে, “আচ্ছা সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পিশাচের ওই অদ্ভুত সুরের সম্পর্কটা ঠিক বুঝলাম না!”

বীরু নীলের মুখে সুরের কথা শুনে অবাক হলেন। তারপর বললেন, “বিমলার বাচ্চাটা কথা বলতে পারত না। কথা বলার চেষ্টা করলেই এক অদ্ভুত মিহি তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসত। এত তীক্ষ্ণ সেই আওয়াজ বেশিক্ষণ শুনলে মাথা ঝিমঝিম করত। তোমরা কি সেই সুরের কথাই বলছ!”

বীরুর কথা শুনে এবার পুরোটা পরিষ্কার হয়ে যায় শিবেনের কাছে। আসলে পিশাচের সেই পৈশাচিক সুর যা শুনলে মাথার শিরা উপশিরা যেন ছিঁড়ে যেতে চায় সেই সুর আর কিছুই না বেঁচে থাকাকালীন ওই বাচ্চাটির কথা বলতে চাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা যা এখন মৃত্যুর পর পৈশাচিক সুরে পরিণত হয়েছে। পুরোটা শোনার পর এবারে তীর্থ বলে, “তাহলে এবারে

আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?”

শিবেন নির্ভয়ে বলে ওঠে, “এই গ্রামের সীমান্তবর্তী জঙ্গল!”

বীরু একটু ভয়ে ভয়েই বলল, “কিন্তু ওই জঙ্গল বড়োই ভয়ানক। খুব গভীর জঙ্গল কিন্তু! ওখানে কি কিছু আর তোমরা খুঁজে পাবে?”

শিবেন হালকা হেসে বলে, “গভীরতার মাঝেই তো লুকিয়ে থাকে প্রকৃতির আদিমতম রহস্য!”

// ২১ //

সূর্য এখন মাথার ওপরে। শিবেন, নীল, তীর্থ সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত জঙ্গলের প্রান্তে। বীরুও এসেছে ওদের সাথে। শিবেনের মতে এই জঙ্গলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে কিন্তু এত বড়ো জঙ্গলে কিছু খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজে পাওয়ার মতোই অবস্থা।

শিবেন তো একমনে খুঁজে যেতেই ব্যস্ত, কী যে খুঁজছে সে কিছুই তীর্থের বোধগম্য হচ্ছে না। তার মন এখন চরম বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। এখন মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হতো। বেশি রোমাঞ্চ অনুভব করতে এসে না এখন জঙ্গলের বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় খেতে হয়।

এগোতে এগোতে অনেকটা জঙ্গলের গভীরে চলে এল ওরা। এবারে ওদের খানিকটা অবাক হওয়ার পালা। কারণ যতই ওরা এগোচ্ছে ততই গাছপালা গভীর হওয়ার বদলে হালকা হচ্ছে। খুব অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি। বীরু কাকার মতে, হয়তো সেই অঘোরী তান্ত্রিক এসে এখানে বসবাস করতেন বলে এরকম হলেও হতে পারে কিন্তু সে তো অনেকদিনের আগের কথা। এতদিনেও এখানে গাছপালা জন্মায়নি? এটা কিন্তু বড়োই অদ্ভুত।

আরও কিছুটা এগোতেই এবারে বিকট মাংসপচা গন্ধে শিবেন বাদে সকলের গা গুলিয়ে উঠল।

তীর্থ ঘৃণায় বলে উঠল, "ইশ মা গো! অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল!"

নীলও বলে উঠল, "নির্ঘাত কোনো জন্তু জানোয়ার মরে পড়ে আছে আর তার থেকেই এমন বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে!"

বীরু বেশ খানিকটা অবাক হয়ে বলল, "জন্তু! আমি তো সেই ছোটো থেকে গ্রামে, এই জঙ্গল থেকে কোনো জন্তু ঢুকেছে বলে শুনিনি!"

তীর্থ বলল, "তোমার বয়স হয়েছে তাই তোমার মনে নেই। এমন বিকট গন্ধ আর কোথা থেকেই বা আসবে?"

বীরু নিশ্চিত হয়ে বলল, "না গো বাবু আমার কোনো ভুল হচ্ছে না। এই জঙ্গলে কোনো জন্তু নেই!"

নীল বলল, "তাহলে এই জঙ্গলে কেউ ঢোকে না কেন?"

বীরু পরিষ্কারভাবে বলল, "আরে এদিকটায় রাজবাড়ি ছিল! সে অনেক বছর আগের কথা। এই রাজবাড়ির লোকেরা সব ছেড়ে শহরে চলে গেছে। এখন ওই রাজবাড়ি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। আর তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ কোনো গ্রামে পরিত্যক্ত রাজবাড়ি থাকলে কী কী সব ঘটনা রটে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, তার ওপর ওই অঘোরী সাধু এখানে এসে থাকার পর আর কেউই এদিকটায় আসার সাহস পায় না!"

শিবেন এবারে হঠাৎ বলল, "আমাকে ওই রাজবাড়ির দিকটায় নিয়ে চলুন!"

শিবেনের কথা শুনে বীরু একেবারে হা হা করে ছুটে এল কিন্তু শিবেন কোনো কথা শোনার পাত্র নয়। উপরন্তু তার কটা চোখের রাঙানি দেখে বীরু মুখ কাচুমাচু করে আমাদের সেই রাজবাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

রাজবাড়ির যত কাছাকাছি এগোচ্ছে ওরা ততই সেই দুর্গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। বাতাসে এমন বিকট গন্ধে দম নেওয়াও মুশকিল হচ্ছে। এবারে তীর্থ থেমে গিয়ে বলল, "ব্যস আর আমি এগোতে পারছি না। এবারে খোলা বাতাসে দম না নিতে পারলে নির্ঘাত এখানেই মারা পড়ব!"

নীল আর বীরুকে দেখেও মনে হল তারাও তীর্থের কথায় সায় জানাচ্ছে। শিবেন ওদের অবস্থা দেখে কিছুটা মুচকি হাসে। তাদের সকলের অবস্থা সত্যিই খুব শোচনীয়।

শিবেন বলল, "বেশ তোমাদের আর এগোতে হবে না! তোমরা বরং এখান থেকে ফিরে যাও। আমি আমার কাজ সেরে ঠিক পৌঁছে যাব!" এই বলে শিবেন একা একা সামনের দিকে এগিয়ে গেল হনহন করে। নীল, তীর্থ, বীরু ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে নীল বলল, "এতদূর এসে আসল জায়গায় মিস করব? না না তোমরা বরং এখানে দাঁড়াও আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি কী হচ্ছে!"

বীরু নীলের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলে, "দাদাবাবু একা যেও না। উনি সাধক মানুষ তাই ওঁর কাছে কোনো ব্যাপার না, কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ বলো। এই যে এই দুর্গন্ধ এটা কি তোমার স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে?"

তীর্থ হঠাৎ, "আচ্ছা বীরু কাকু, তুমি বলছিলে যে বিমলাকে নাকি শেষবার সবাই এই জঙ্গলেই ঢুকতে দেখেছিল। আচ্ছা এরকম তো হতেই পারে যে বিমলা অনেকদিন আগেই মারা গেছে, আর তার লাশই পচে পচে এরকম দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে!"

এই ব্যাপারটা কিন্তু বীরুর মনে সত্যিই আসেনি। এবারে সে ধন্দে পড়ল।

তীর্থও এবারে বীরুকে বলে, "চলো চলো এগিয়ে দেখাই যাক শিবেনদা কী করে!"

নীল বলে, "তুই তো এতক্ষণ ধরে এগোবি না বলছিলি!"

তীর্থ বলল, "ঠিক আছে এখন তো বলছি, চল এবারে! বীরু কাকু তুমি বলো রাজবাড়িটা কোনদিকে?"

বীরু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো ওইদিকে, এস, সাবধানে এগোবে!"

পুনরায় তিনজনে সামনের দিকে এগোতে থাকে।

রাজবাড়ির কাছে এসে কিন্তু শিবেনকে দেখা গেল না। রাজবাড়ির সামনে, পিছনের দিকে সব জায়গাই খোঁজা হল কিন্তু শিবেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ওইদিকে তীর্থ এত বড়ো রাজবাড়ি দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়েছে। এখন না হয় এই বাড়ির ভূতুড়ে অবস্থা কিন্তু একটা সময় যে এই রাজবাড়ি বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল তা বোঝাই যায়।

কোথাও শিবেনকে না পেয়ে নীল বলল, "আমার মনে হচ্ছে শিবেনদা ভেতরেই গেছে! চলো একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসি!" বাকি দুজন নীলের কথায় সম্মতি জানিয়ে যেই না ভেতরে পা বাড়াবে অমনি রাজবাড়ির একটা নির্দিষ্ট কক্ষ থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর গলার স্বর। "এইদিকে! এইদিকে চলে এস সবাই!"

সবাই ওই গলার স্বর অনুসরণ করে যেখানে এসে পৌঁছাল সেখানে দুর্গন্ধটা মাত্রা ছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। নীল বলে, "উফ! আর পারা যাচ্ছে না শিবেনদা দরজাটা খোলো আমার মনে হয় এখানেই কোনো জন্তু মরে পচে আছে!" নীলের কথা শুনে শিবেনের মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে যায়।

"তোমাদের কি সত্যিই মনে হচ্ছে এখানে কোনো জন্তু মরে পড়ে আছে?" শিবেনের কথায় নীল, তীর্থ আর বীরু বেশ অবাক হয়!

তীর্থ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "মানে কী আছে ভেতরে? তুমি দেখেছ?"

শিবেন বলে, "ভেতরে যিনি আছেন তাকে দেখে তোমাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাবে এইটুকু বলতে পারি!" এই বলে একটা অদ্ভুত চাপা হাসি হাসতে হাসতে এক ধাক্কায় দরজাটা ভেঙে ফেলল শিবেন। সেকেলের পুরোনো দরজাটা ভাঙার সাথে সাথে ভেতরের দুর্গন্ধময় তীব্র অন্ধকার নীলেদের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বীরু আর সহ্য করতে পারে না। কিছুটা দূরে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সকালের খাওয়া সমস্ত খাবার উগড়ে দিলেন। তীর্থও প্রবল ঘেন্নায় ওয়াক করতে লাগল। শুধু নীল দাঁড়িয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে। এতক্ষণ অন্ধকার থাকার দরুন খেয়াল না করলেও এবারে অন্ধকারে চোখ ভালোই পরিষ্কার হয়েছে। শিবেনের ধাক্কা মারার সাথে সাথে দরজাটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গিয়েছিল, সাথে ওই ঘরের

একপাশের দেওয়াল থেকেও চুন, সুড়কি, ইট যা ছিল তা জায়গায় জায়গায় পড়ে গিয়ে বাইরের সামান্য আলো ভেতরে আসার উপায় করে দিল আর সেই অল্প আলো অল্প আঁধারেই নীল দেখল এক ভয়াল দর্শন জীব বসে আছে। তার সারা শরীরে পচন ধরেছে। সেখান থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে মাংস! অজস্র পোকামাকড় ঘিরে রয়েছে জীবটাকে। মনে হচ্ছে জীবটার দেহ থেকে সমস্ত মাংস, রস, মজ্জা শুষে খাচ্ছে সেগুলো। জীবটার মধ্যে কিন্তু এখনও প্রাণের অস্তিত্ব আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বহুকাল পরে তার চোখে আলো এসে পড়েছে কারণ আলোটা আসার সাথে সাথেই সে বিকট চিৎকার করতে শুরু করেছে। এক তীব্র গোঙানি, মনে হচ্ছে আলো না কেউ আগুনের হলকা ছেড়ে দিয়েছে তার গায়ে।

নীল ভয়ার্ত স্বরে বলে, "এ... এ... এটা কী? কী এটা?"

শিবেনের মুখের বাঁকা হাসি এখনও দৃশ্যমান, তার মুখ দিয়ে শুধু একটাই নাম শোনা যায়, "বিমলা!"

****

এখন সূর্য অস্ত গিয়ে পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে রেখে গেছে এক মায়াবী লাল আভা। বীরু সেদিকেই বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিল, হুঁশ ফিরল নীলের ডাকে।

"বীরু কাকু এখন কেমন বোধ করছ?" নীলের কথা শুনে এবারে বীরু হালকা করে ওপরে নীচে মাথা দোলায় মানে সে এখন সুস্থ বোধ করছে।

তীর্থও পাশেই বসে ছিল, এবারে সে হঠাৎ বলল, "বি... বিমলার এ... এরকম অবস্থা হল কী করে ভাই? কী বীভৎস, আমার তো এখনও গা-হাত-পা কাঁপছে। বাউডিহিতে যে আছে সে নয় প্রেত কিন্তু বিমলা তো জীবন্ত প্রেতে পরিণত হয়েছে!"

নীল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "সবই অতিরিক্ত হিংসা আর লোভের ফল! সেদিন যদি সে নিজের রাগকে সংবরণ করতে পারত, যোগেন্দ্রকে মেনে নিয়ে একসাথে সংসার করত তাহলে আজ কত সুন্দর একটা সংসার পেতে পারত সে! শুধু বিমলার অতিরিক্ত হিংসার জন্যই আজ যোগেন্দ্রর মতো ভালো মানুষ শেষ হয়ে গেল, নিজের সন্তান অমন অভিশাপ নিয়ে জন্মাল আর মৃত্যুর পর অমন পিশাচে পরিণত হল, যে কিনা এখন গোটা বাউডিহির ত্রাস!" নীলের কথায় তীর্থ, বীরু দুজনেই সমর্থন জানায়। এতক্ষণে সেই মাংসপচা গন্ধ বিদায় নিয়েছে। শিবেন কী একটা মন্ত্রোচ্চারণ করে সাদা মতো জিনিস ছড়াতেই বাতাসে একটা পবিত্র সুবাস ছড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্গন্ধও দূর হয়।

বীরু জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু বিমলার এই হাল হল কী করে?"

"সবই কর্মফল!" ওদের কথোপকথনের মাঝেই হঠাৎ এসে দাঁড়ায় শিবেন! "আজ থেকে বহু মাস আগে বিমলা এসেছিল এই জঙ্গলে অঘোরী তান্ত্রিকের কাছে তার হিংসা চরিতার্থ করতে। যোগেন্দ্রর প্রতি হিংসা তো সেই প্রথম থেকেই ছিল তার কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হতে হতে সেই হিংসাই জন্ম নেয় এক ভয়ানক ক্রোধে। সেই ক্রোধের বশেই সে অঘোরী তান্ত্রিকের কথায় নিজের ছেলেকে বলিদান দেয় শয়তানের কাছে, যোগেন্দ্রকে শেষ করার উদ্দেশ্যে। মূর্খ বিমলা বুঝতেও পারে না কী চরম ভুল সে করল। সেই তান্ত্রিক বিমলাকে কোনো সাহায্য করতে নয় বরং নিজের ভয়ানক কোনো সাধনার কাজে তাকে লাগিয়েছিল। সেই সাধনার জন্য তার প্রয়োজন ছিল এক বীভৎস প্রেতের যে হবে মারাত্মক শক্তিশালী একইসাথে হবে ধূর্ত!"

নীল জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু প্রেতের জন্মে অঘোরীর কী লাভ ছিল?"

শিবেন বলল, "লাভ অনেক ছিল। সেই বাচ্চাটি অবহেলা, ঘৃণা এবং ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে করতেই মারা যায়। অঘোরী নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার আত্মাকে বানিয়েছিল এমন এক অসীম ক্ষুধার অধিকারি প্রেত যার ক্ষুধা নিবারণ কখনও সম্ভব নয়। ক্ষুধার যেমন কোনো লয় নেই ঠিক সেরকম ওই পিশাচেরও ক্ষুধার কোনো অন্ত নেই। সেই ক্ষুধিত প্রেত শিকার করে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করছিল ঠিকই কিন্তু তোমাদের কী মনে হয় সেই মৃত মানুষগুলো কি মুক্তি পেয়েছিল?"

এই কথা শুনে সবাই বিস্ফারিত হয়ে শিবেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিবেন ক্রমাগত বলে যায়, "সেই প্রেতের শিকার করা প্রত্যেকটা মানুষের আত্মা বন্দি হচ্ছিল সেই অঘোরীর কাছে। অমরত্ব পেতে হলে তো এইসব তাকে করতেই হতো! বাউডিহির প্রেত তো একটা মাধ্যম মাত্র!"

শিবেনের কথায় সবাই হতচকিত হয়ে যায়। একটা পিশাচের আবির্ভাবের পেছনে এতগুলো মানুষের এমন এমন সব কাহিনি থাকতে পারে তা সত্যি না শুনলে বা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না নীল বা তীর্থর!"

বীরু বলল, "বিমলার এই অবস্থার কারণ না হয় বুঝলাম কিন্তু প্রেতকে শেষ করার উপায় কোথায় হল?"

শিবেন একটু হেসে বলে, "প্রেতকে শেষ করার উপায় তো ওই ঘরেই রয়েছে!"

তিনজনই এই কথা শুনে আরও অবাক হয়ে যায়।

ওরা যে কিছু বোঝেনি তা তাদের মুখ দেখেই স্পষ্ট। "ওই প্রেতের সমস্ত শক্তির আধার

রয়েছে বিমলার শরীরে। অঘোরী তান্ত্রিক অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি এই গ্রামের মানুষের ভয়কে কাজে লাগান। এই জঙ্গলের একটা দুর্নাম আগে থেকেই ছিল, অঘোরী আসার পর সেই দুর্নাম আরও বৃদ্ধি পায়। সে খুব ভালো মতোই জানত, জঙ্গলের ধারে কাছে কেউ আসে না, আর বিমলাও গ্রামবাসীদের চক্ষুশূল, তাই সে উধাও হল নাকি মারা গেল সেই নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না। এই উপায়টাকেই সে কাজে লাগায়। সকলের চোখের আড়ালে বিমলাকে লুকিয়ে রাখে এখানে আর এমন একটা ঘরে তাকে লুকিয়ে রাখে যার সামনে ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি। ফলে সাপখোপের ভয়ে এদিকে কেউ পা মাড়াবে না!" এই বলে শিবেন থামে। তার সমস্ত কথা শুনে নীল, তীর্থ আর বীরু তিনজনই অবাক চোখে নিশ্চুপ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

"এবার যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে বিমলার এই অবস্থা হল কী করে তাহলে তোমাদের আর একটা কথাও জানিয়ে রাখি, তোমরা যাকে চোখের সামনে দেখলে তার মৃত্যু অনেকদিন আগেই ঘটে গেছে! শুধু সেই আত্মা বন্দি হয়ে রয়েছে সেই শরীরে! সেই শরীর গলে পচে গিয়ে হাড় বেরিয়ে গেলেও বিমলার আত্মার মুক্তি ঘটবে না যতক্ষণ না সে নিজেই নিজের কাজে অনুতপ্ত হয় এবং কোনো পুণ্যাত্মা সাধক তাকে মুক্ত করে!" এইবারের কথাটা শুনে তিনজনই অবাক বিস্ময়ে এবং কৌতূহলী চোখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

নীল বিস্ময়ে বলল, "কী বলছ কী? এও সম্ভব?"

শিবেন একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে, "সবই সম্ভব!"

বীরু বাবু একটা ক্লান্ত হাসি হেসে বলেন, "বিমলার কি ভাগ্য! মৃত্যুর পরও তার শান্তি নেই!"

শিবেন বলল, "সবই বিমলার কর্মফল। কী জানেন তো একটা কথা, মানুষের প্রত্যেকটা কর্মের হিসাব তোলা থাকে নির্দিষ্ট জায়গায়। প্রত্যেককেই নিজের কর্মফল একজন্মেই ভোগ করে যেতে হয়। যাক গে সে সব কথা, এখন আমাদের আসল কাজটা সেরে ফেলতে হবে। বেশি দেরি হয়ে গেল খুব মুশকিল। বাউডিহির পিশাচ একবার যদি জেগে ওঠে তাহলে তার শক্তি হবে আগের থেকেও দ্বিগুণ। তখন সে নারকীয় মৃত্যু খেলায় মেতে উঠবে। তাই তার আগেই তাকে বিনাশ করতে হবে!" এই বলেই শিবেন আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করে যে ঘরে বিমলার পচা গলা শরীর পড়ে রয়েছে। তার আগে সে নীল, তীর্থ আর বীরুকে বিশেষ তিনটে জায়গার কথা বলে দেয় যার মধ্যে যে-কোনো একটি জায়গায় সেই বাচ্চাটির দেহাংশ পুঁতে রাখা আছে। সেই দেহাংশকে এক বিশেষ মন্ত্র পড়ে

সৎকার করতে হবে বাউডিহির শ্মশানে তবেই সেই পিশাচের মুক্তি সম্ভব। তাই তারা শিবেনের কথা মেনে চলে যায় রাজবাড়ির তিনদিকে তিনটি বিশেষ স্থানে বাচ্চাটির দেহাংশ খুঁজতে।

এইদিকে শিবেন ঘরের ভেতর ঢুকে বিমলার পচা গলা শরীরটার পাশে এসে কী যেন বিড়বিড় করে বলে আর তারপরেই এক ভয়াল নারকীয় স্বর শুনতে পাওয়া যায়। বিমলার আত্মা! সে মুক্তি চাইছে! কাতর স্বরে আর্জি জানাচ্ছে তার সামনে বসে থাকা পুণ্যাত্মা সাধকটিকে তাকে মুক্ত করার জন্য! তার গলা থেকে নির্গত জান্তব স্বরেই সে বলার চেষ্টা করছে, সে অনুতপ্ত, অনেক বড়ো পাপ করে ফেলেছে সে, এই অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। কিন্তু এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করার মতো শক্তি আর নেই তার! সে মুক্তি চায়, মুক্তি!

শিবেন হালকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বোজে, শুরু করে মন্ত্রোচ্চারণ!

ওইদিকে তীর্থ রাজবাড়ির একদিকে অবস্থিত ভাঙাচোড়া মন্দিরের চারিপাশ যতটা সম্ভব তন্নতন্ন করে খুঁজল কিন্তু যেটা দরকার সেরকম কিছুই হস্তগত হল না তার। নীলও রাজবাড়ির মাঝ বরাবর অবস্থিত কক্ষে চারিপাশ ভালো করে খুঁজেও একরাশ ঝুল আর ধুলোয় জমাটবাঁধা পুরোনো দিনের আসবাবপত্র ছাড়া কিছুই পেল না। অন্যদিকে বীরু গেল রাজবাড়ির পিছনের দিকে। সে বুদ্ধি করে টর্চটা নিজের সাথেই এনেছিল। টর্চের আলোয় সে ভালো করে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এগোতে শুরু করল। সামনের দিকে বেশ কিছুটা এগিয়েই কিছুর মধ্যে পা পড়তেই একটা আর্তনাদ শোনা গেল। চমকে ওঠে দু পা পিছিয়ে সেইদিকে টর্চ ফেলতেই বীরু দেখলো একটা কালো কুচকুচে কুকুর তার দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে আওয়াজ করে যাচ্ছে আর তার মুখে ধরা আছে একটা হাড়, মানুষের হাড়। কুকুরটার চোখে তীব্র আলো পড়তেই সে পালাতে শুরু করল। তাই দেখে বীরু চিৎকার করে নীল আর তীর্থকে ডাকতে থাকে। ওরাও বীরুর চিৎকার শুনে রাজবাড়ির পিছনের দিকে ছুটে যায়।

বীরু বলে ওঠে, "কুকুরটাকে আটকাও, আটকাও। হাড় নিয়ে পালাচ্ছে ব্যাটা!"

পায়ের সামনে একটা পাথর পড়ে থাকতে দেখে নীল সেটাকে তুলে সটান ছুঁড়ে মারল কুকুরটাকে লক্ষ করে। এইবারে কুকুরটাও সেই আচমকা আঘাতে মাটিতে পড়ে কুইকুই করে ডাকতে লাগল। তার পাশে পড়ে থাকা হাড়টা সাথে সাথে এসে তুলে নেয় বীরু। কুকুরটা তখনও ওইভাবেই ডাকছে। বেচারার খুব জোড়েই লেগেছে কিন্তু ওদেরও কিছু করার নেই। কিছুক্ষণ পর ব্যথা কমাতেই কুকুরটা নিজেই উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওইদিকে বীরুও নীল আর তীর্থকে রাজবাড়ির পিছনের দিকে নিয়ে আসে যেখানে সে দেখেছিল কুকুরটাকে হাড় মুখে নিয়ে। সেখানে ভালো করে দেখতেই একটা জায়গায় মাটি কিছুটা খোঁড়া দেখে ওদের সন্দেহ হয় এবং সেখানে গিয়ে পুরোটা খুঁড়তেই একটা লাল কাপড়ে মুড়ে রাখা কিছু একটা বেরিয়ে আসে। সেটাকে খুলতেই দেখা যায় একটা বাচ্চার হাড়গোড় আর দুটো মাথার খুলি!

সেইগুলো নিয়ে ওরা চলে আসে শিবেনের কাছে। ততক্ষণে সেই জান্তব আওয়াজে কান পাতা দায়। বাইরে দাঁড়িয়েই তারা দেখতে পেল এক অদ্ভুত রক্তের মতো লাল আলোর শিখা বেরিয়ে আসছে বিমলার পচাগলা শরীর ভেদ করে আর তাতেই তার করুণ আর্তনাদও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু সময়ের মধ্যেই সেই আলোক শিখা শিবেনের হাতের তালুতে এসে স্থির হল এবং সাথে সাথে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেই আলো ধীরে ধীরে মিশে যেতে লাগল শিবেনের শরীরে এবং একটা সময় তার শরীর থেকে একটা লাল আলোর আভা বিচ্ছুরিত হতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে বিমলার করুণ আর্তনাদ একটা তীব্র বিকট আওয়াজ করেই থেমে গেল চিরকালের মতো। আর তারপরেই মুহূর্তের মধ্যেই ভগ্নপ্রায় রাজবাড়ির এক অংশ ধসে পড়ে গেল। ব্যাপারটা এতটাই দ্রুত ঘটল যে ওরা তিনজন জায়গা থেকে নড়তে পর্যন্ত পারল না। এবারে তিনজনেই ভয় পেয়ে সমস্বরে শিবেনকে ডেকে উঠল।

"শিবেন!" "শিবেন দা!"

"আমাদের এখানের কাজ শেষ হয়েছে, এবারে আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বাউডিহিতে!"

পিছন থেকে চেনা গলার স্বর পেয়ে ঘুরে তাকাল নীল, তীর্থ আর বীরু। সাথে সাথে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওরা।

তীর্থ বিস্ময়ে বলে উঠল, "তু... তুমি তো ওখানে ছিলে তাহলে এখানে কী করে..."

শিবেন হালকা হেসে ফেরার পথ ধরে।

নীল তীর্থের হা হয়ে থাকা দেখে বলে, "সত্যিই তুই কি মাঝে মাঝে ভুলে যাস যে উনি শিবশঙ্কর তান্ত্রিক। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ উনি নন! নে মুখটা এবারে বন্ধ কর আর চল!"

// ২২ //

বীরুর বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতেই সন্ধে পেরিয়ে রাত নামল। বাড়িতে আসতেই বীরু দেখল কালীতলার ঠাকুরমশাই মানে পাঞ্চালীর বাবা এসে বসে আছেন। শিবেনকে আসতে দেখেই তিনি বললেন, "আমি আপনাদের সাথে বাউডিহিতে যেতে চাই। যোগেন্দ্রর এমন অবস্থা শোনার পর আমি কিছুতেই শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারছি না। হয়তো আমার মেয়েটাও আর বেঁচে নেই! কিন্তু তা-ও আমি যাব, আমার মেয়ের সাথে কী হয়েছিল তা আমাকে জানতেই হবে!" তার চোখ জলে ভিজে উঠল। শিবেন তার কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বাসের সুরে বলল, "আমি আপনাকে আটকাব না। অবশ্যই আপনার অধিকার আছে আপনার মেয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার! তবে আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে। রাতের মধ্যে যে করেই হোক বাউডিহিতে পৌঁছাতেই হবে। নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!"

বীরু বলে উঠল, "তোমায় চিন্তা করতে হবে না। আমি আগে থেকেই আমার এক বন্ধুকে বলে রেখেছি। ও এক্ষুনি তোমাদের জন্য ভ্যান পাঠাল বলে! ও... ওই তো গদাই এসে গেছে। ওই তোমাদের নিয়ে যাবে বাউডিহিতে। নাও এবারে তোমরা বেরিয়ে পড়ো আর সাবধানে যেও!"

বীরুকে বিদায় জানিয়ে ওরা চারজন উঠে পড়ল ভ্যানে। সকলেরই চোখে মুখে দুশ্চিন্তা খেলা করে বেড়াচ্ছে। শিবেনের কথা মতো আজ মধ্যরাতেই সেই পিশাচের জেগে ওঠার সম্ভাবনা আছে। যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে বাউডিহি গ্রামে মড়ক লেগে যাবে। তখন শিবেনেরও কিছু করার থাকবে না। সেই পিশাচ হবে আগের থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী। তবে এত সহজে এটা ভাবলেও বাউডিহিতে পৌঁছানো যে কঠিন হবে তা আর কেউ না বুঝুক শিবেন ঠিকই আঁচ করতে পেরেছে। তাকে পথে আটকানোর জন্য নানান বাঁধা এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা শিবেন সত্যিই আশা করেনি।

গদাই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ভ্যানটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু হঠাৎই অন্ধকারের মাঝে রাস্তার মধ্যিখানে একটা কালো কুচকুচে বেড়াল এমনভাবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে গদাই বুঝতে না পেরে তার গায়ের ওপরেই দিল ভ্যানটা তুলে। বেড়ালটা চরম আর্তনাদ করে উঠল। অন্যসময় হলে হয়তো ওরা সবাই নীচে নেমে দেখত কিন্তু শিবেনই বারণ করল। কারণ এই মুহূর্তে বাউডিহিতে পৌঁছানো আগে প্রয়োজন।

কিন্তু এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটল আর এক বিপদ। মাঝ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই ভ্যানের ডান চাকা গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল নীল, তীর্থ, শিবেন আর ঠাকুরমশাই। আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে শিবেন হেঁটেই বাউডিহিতে পৌঁছাবে বলে স্থির করল। নীল বা তীর্থকে নিয়ে কোনো অসুবিধা না থাকলেও শিবেনের প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল ঠাকুরমশাইকে নিয়ে, তিনি ষাটোর্ধ্ব মানুষ, তার পক্ষে এখন এতটা হেঁটে বাউডিহিতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের অসীম জেদ ও মনের জোড় দেখে শিবেন আপ্লুত হয়। সে কোনোমতেই এই বিপদ দেখে পিছু হটতে রাজি নয়। অগত্যা চারজনে হেঁটে যাওয়া মনস্থির করে। রাস্তাতে নানান ছোটোখাটো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় ওদের। কখনও অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া, রাস্তা ভুল করে অন্য দিকে চলে যাওয়া, কখনও হঠাৎ চোখের সামনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হওয়া, একটার পর একটা ঘটনা ঘটতেই থাকে। কিন্তু কোনো কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। অবশেষে একটা সময় পর ওরা এসে উপস্থিত হয় বাউডিহি গ্রামের সীমান্তে। কিন্তু গ্রামের কাছাকাছি আসতেই একটা ব্যাপার বুঝতে পেরে ওরা হতচকিত হয়ে যায়। দূর থেকে অনেক মানুষের সম্মিলিত কোলাহল ভেসে আসছে। কিছুটা এগোতেই ব্যাপারটা ওদের বোধগম্য হয়। নীল হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে বলে ওঠে, "শিবেনদা দেখো জঙ্গলে আগুন লেগেছে!"

শিবেন বিস্ফারিত চোখে তা দেখে বলে, "সর্বনাশ তবে যেটা ভয় পাচ্ছিলাম সেটাই হল শেষমেশ?"

নীল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, "মা... মানে কী হয়েছে?"

শিবেন গম্ভীরভাবে বলল, "পিশাচ জেগে উঠেছে, এখান থেকে যা বুঝতে পারছি তাতে মনে হচ্ছে সে তার তাণ্ডবলীলা শুরু করেছে! তাড়াতাড়ি চলো!"

গ্রামের ভেতরে ঢুকতেই ওরা দেখল গ্রামের মানুষ যে যেদিকে পারছে ছুটে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা বাড়িতে আর দূরে জঙ্গলে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের লেলিহান শিখায় অনেকাংশ দৃশ্যমান হয়েছে। তার মধ্যেই একটা দৃশ্য দেখে তাদের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। বেশ কয়েকটা মুণ্ডহীন ক্ষতবিক্ষত খুবলে খাওয়া দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নীচে। বাউডিহির অবস্থার কথা জানলেও এই ভয়াবহতা নিজের চোখের সামনে যে এইভাবে প্রকট হয়ে উঠবে তা পাঞ্চালীর বাবা আশা করেননি। তাই তার পাশে দাঁড়ানো নীলের হাতের কবজি ধরে ভয়ে কাঁপতে থাকেন তিনি।

শিবেন এবারে ব্যস্ত হয়ে নীলকে বলে, "নীল, তোমাকে আসার পথে যা যা বুঝিয়ে দিয়েছি

তোমার সমস্তটা মনে আছে তো?"

নীল তাকে আশ্বস্ত করে বলে, "হ্যাঁ শিবেনদা মনে আছে!"

শিবেন বলে, "বেশ তবে তুমি আর দেরি না করে এক্ষুনি ওই লাল পুটুলিটা নিয়ে শ্মশানে যাও আর তোমার সাথে ঠাকুরমশাইকেও নিয়ে যাও। উনি এইসব দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন না!"

শিবেনের কথা শেষ হওয়া মাত্রই নীল ঠাকুরমশাইকে নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা দিল।

ওইদিকে শিবেনকে দেখতে পেয়ে বীরেন, কমলা আরও কয়েকটা গ্রামের লোক ছুটে আসে তাদের দিকে।

বীরেন বলে ওঠে, "শিবু রে! সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই নরপিশাচ জেগে উঠেছে রে। সবাইকে মেরে তার খিদে মেটাচ্ছে শয়তানটা! তুই কিছু কর রে..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই কমলার তীব্র চিৎকারে সবাই সেইদিকে ফিরে তাকায় আর তাকাতেই তাদের শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়। তীব্র ভয়ে তারা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। কয়েকজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়, "ওরে পালা রে! কমলাকে ধরেছে এবারে, সবাইকে মেরে শেষ করবে ওই পিশাচ, কেউ বাঁচবে না আর!"

তীর্থ শিবেনের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। পিশাচকে পুনরায় নিজের চোখের সামনে দেখতে পেয়ে সেইদিনকার রাতের স্মৃতি ফিরে আসে তার। ভয়ে শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে ওঠে। এবারে হঠাৎ একটা চেনা মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পায় সে। শিবেনের মুখনিঃসৃত সেই মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি তার খুব চেনা। সেইদিন রাতেও ওরা এই মন্ত্রোচ্চারণই শুনেছিল। সেই মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হতেই পিশাচের নজর পড়ল শিবেনের দিকে। কমলাকে তুচ্ছ বস্তুর ন্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবারে সে শিবেনের দিকে এগোতে লাগল। এইবারে শিবেন হঠাৎ তার ত্রিশূল পিশাচের অভিমুখে সরাসরি ধরে চোখ বন্ধ করল এবং পরক্ষণেই তার চোখ খোলার সাথে সাথেই এক তীব্র আলোকরেখা সেই ত্রিশূল থেকে নির্গত হয়ে ঘিরে ফেলল সেই পিশাচকে। সেই জ্বলন্ত চক্রব্যূহে আটকা পড়ে তীব্র গর্জন করতে লাগল নরপিশাচ।

গ্রামবাসীরা ছোটাছুটি বন্ধ করে এই অবাক কাণ্ড চাক্ষুষ করছিল। এবারে তারা দেখল হঠাৎ শিবেনের চারিপাশ থেকে যেন এক লাল আলোর আভা নির্গত হচ্ছে। আলোটা তার শরীরের ভেতর থেকে নির্গত হয়ে ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে এরকম লাল আভা নিঃসৃত সৌম্যকান্তি পুরুষকে দেখে অজান্তেই সবাই কপালে প্রণাম ঠুকল। এইদিকে সেই লাল আভা যত তীব্র হচ্ছে সেই পিশাচের নারকীয় আর্তনাদ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা

সময় সেই লাল আভা প্রবল বেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই পিশাচটার ওপর। সকলে নিজের চোখের সামনে দেখতে থাকে কী অদ্ভুতভাবে সেই লাল আভা শিবেনের দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিচ্ছে সেই পিশাচকে। তার অজাগতিক আর্তনাদ শুনে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রত্যেকটা মানুষ। এইদিকে ঠাকুরমশাইকে নিয়ে শ্মশানে পৌঁছে নীল শিবেনের কথামতো সমস্ত কাজ শুরু করে দিয়েছে। দূর থেকে সেই পিশাচের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে তাদের হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। সেই অমানুষিক পরিবেশেও নিজেকে শক্ত রেখে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে নীল আর পাঞ্চালীর বাবা। পিশাচের তীব্র গর্জনে ঢাকা পড়ে যায় তাদের মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি।

সেই লাল আলোর ঝটকায় ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল পিশাচটা। তার নারকীয় আর্তনাদ কমে গিয়ে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। একটার পর একটা এরকম মানসিক আঘাতে বিধ্বস্ত বাউডিহির মানুষ যখন ধীরে ধীরে আশার আলোয় আলোকিত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হল সবাই। কোথা থেকে একটা ধারালো ত্রিশূল প্রায় তীব্র বেগে উড়ে এসে গেঁথে যায় শিবেনের বুক বরাবর। একটা আর্তনাদ করে ওঠে প্রায় লুটিয়েই পড়ে সে। সবাই এই ঘটনায় হকচকিয়ে যায়। প্রত্যেকে ছুটে আসে শিবেনকে বাঁচাতে। কিন্তু একটা বীভৎস বিকট অট্টহাসিতে সবাই ওখানেই থমকে যায়। সেই মুহূর্তে সেখানে আর একটা অবয়বের আবির্ভাব ঘটে। যাকে দেখে বাউডিহির প্রত্যেকটা মানুষের গায়ের রোম খাঁড়া হয়ে যায়। সারা শরীর ছাই ভস্মে মাখামাখি, রক্তজবার মতো লালচে চোখ, প্রায় ৭ ফুট উচ্চতার জটাধারী সেই ব্যক্তি, অঘোরী তান্ত্রিক।

এবার তার গনগনে তাচ্ছিল্য ভরা স্বর শোনা যায়, "শিবশঙ্কর তান্ত্রিক! হা হা হা! মহাদেবের আশীর্বাদপ্রাপ্ত শিবশঙ্কর তান্ত্রিক? এইটুকুই তার ক্ষমতা? সব শেষ, সব শেষ করে দিলাম। আমার সাধনায় বাঁধা? ভেবেছিলি আমায় অমরত্ব লাভ থেকে আটকাবি? দেখ এখন। দেখ, দেখ তোরাও দেখ তোদের প্রিয় শিবেনের কী হাল করেছি দেখ!" এই বলেই সে আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

মাটিতে লুটিয়ে থাকা শিবেনের দিকে তাকিয়ে বাউডিহির মানুষগুলো থরথর করে কেঁপে ওঠে। বীরেন বুঝি কাঁদতেও ভুলে গেছে। কিছুক্ষণ শিবেনের দেহটার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে পরক্ষণেই তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়ে সে। পাশে পড়ে থাকা শিবেনের ত্রিশূলটা নিয়ে তীব্র বেগে ছুটে যায় অঘোরীর দিকে তাকে সেই ত্রিশূল দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করতে। কিন্তু

তার আগেই অঘোরী তার লম্বা হাত দিয়ে বীরেনের টুটি চিপে ধরে, তাকে শূন্যে তুলে ধরে। শ্বাস নিতে না পেরে বীরেন অঘোরীর শক্ত হাতের বাঁধনে ছটফট করতে থাকে। আবার তার ভারী গলার স্বর সবার কর্ণগোচর হয়। "এখনও তেজ যাই না তোদের? তোরা কী ভাবছিস, তোরা বেঁচে যাবি? তোদের প্রত্যেককে আমি শেষ করব। উজার করে দেব বাউডিহি। শিবেনের মতো তোদেরকেও...", পুরো কথা শেষ করার আগেই একটা তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়, বিশাল বড়ো ত্রিশূল এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় অঘোরীর দেহ। প্রবল যন্ত্রণায় লুটিয়ে পরে সে মাটিতে। অঘোরীর লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথেই দেখা যায় শিবেনকে। কী আশ্চর্য! কোথায় তার ক্ষতস্থান? রক্তের ছিঁটেফোঁটাও লেগে নেই তার শরীরে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শিবেনের দিকে। পাশে পড়ে বীরেনও হতবাক হয়ে যায় শিবেনকে দেখে।

"ক্ষমতা কী তোর একারই আছে নাকি? আর কী বলছিলি? বাউডিহিকে নিশ্চিহ্ন করে দিবি? আমি থাকতে কিছুতেই তুই তা করতে পারবি না। শিবশঙ্কর তান্ত্রিক মহাদেবের আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তুই কেন, কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার না, আজ তোর শেষ দিন। তোর সৃষ্ট পিশাচের সাথে সাথে তোকেও আমি নরকে পাঠাব। তোর মতো নরপিশাচের স্থান ওটাই! নরকে চিরকালের জন্য বন্দি হয়ে থাকবি তুই। তোর মুক্তি ঘটবে না। প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াবি নরকের বুকে। নরকের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করবি তুই। এই হবে তোর শাস্তি!" এই বলে বীরেন চোখ বন্ধ করে তার ডান হস্ত উপরে প্রসারিত করে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে এসে উপস্থিত হয় একটা বিশাল খর্গ। সেই খর্গ দিয়ে এক কোঁপে শিবেন আলাদা করে দেয় অঘোরীর দেহ থেকে তার মুণ্ডটি। তারপরেই শোনা যায় এক তীব্র বজ্রপাত। সেই আলোতে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় তাদের নড়াচড়ার শক্তিটুকুও যেন লোপ পেয়েছে। এবারে তারা চোখ খুলতেই দেখে শিবেনের পায়ের কাছে পরে থাকা রক্তাক্ত অঘোরীর মুণ্ডহীন শরীরটা ধীরে ধীরে একটা কালো ধোঁয়ায় পরিণত হচ্ছে আর সেই ধোঁয়া ক্রমশ ওপরে প্রসারিত হচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকে এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে যেন কাঠের পুতুলের মতো স্তম্ভিত হয়ে যায়, এবারে শিবেন পড়ে থাকা পিশাচের নারকীয় দেহটার বুক বরাবর তার নিজের ত্রিশূলটা সজোরে গেঁথে দেয় আর সাথে সাথেই খুব কাছেই কোথায় যেন আবার বাজ পড়ে। সবাই অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকায়, সেখানে এখন রাশি রাশি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে। তীব্র ঘন কালো মেঘের গর্জন শুরু হয়েছে। সেই কালো মেঘের মাঝে হঠাৎ একটা গর্তের সৃষ্টি হয়। সেই গর্ত দেখে মনে হয় তার এমন ক্ষমতা রয়েছে যা সবকিছু নিমেষে শুষে নিতে পারে। সেই ক্ষমতার বলেই হয়তো শিবেনের

সামনে পড়ে থাকা পিশাচের দেহটাও অঘোরীর দেহের সাথে একটা বৃহৎ কালো ধোঁয়ায় পরিবর্তিত হয়ে সেই মেঘের গর্তের মধ্যে ঢুকে বিলীন হয়ে যেতে থাকে। কেউই এর আগামাথা কিছুই বুঝতে পারে না। বীরেন আর তীর্থ এসে শিবেনকে জিজ্ঞেস করে, "এইসব কী হচ্ছে, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

শিবেন বলে ওঠে, "এই গর্তটা দেখছ, ওটা নরকের দ্বার। এই মুহূর্তে নরকের দ্বার খুলে গিয়েছে! সমস্তটা আমি তোমাদের পড়ে খুলে বলব। এই মুহূর্তে বুঝে নাও যে এই পিশাচের উৎসস্থলের বিলুপ্তি ঘটেছে তাই তাকে চলে যেতে হবে নরকে। তার জন্য নরকের দ্বার খোলা বাঞ্ছনীয়। আর সেই দ্বারই এখন খুলে গেছে!"

ইতিমধ্যে নিজেদের কাজ সেরে ওখানে হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হয়েছে নীল আর ঠাকুরমশাই। তারাও অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

শিবেন খুব আস্তে আস্তে বলে, "এই নরকের দ্বার খুলল বটে কিন্তু এতে আর এক বিপদ এসে উপস্থিত হবে। তা আমি খুব ভালো মতোই অনুভব করতে পারছি!"

তীর্থ বিস্ময়ে বলে ওঠে, "কী বিপদ?"

শিবেন বলে, "সে যাক গিয়ে, সেইসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। তোমরা বরং গ্রামবাসীদের নিয়ে আগুন বেশি ছড়িয়ে যাওয়ার আগে তা নেভানোর ব্যবস্থা করো। আর একটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে!"

ওদের কথা শেষ হতেই দেখা যায় আকাশের ঘন কালো মেঘ কখন সরে গিয়ে পুব আকাশে হালকা রঙের ছটা দেখা দিতে শুরু করেছে। অবশেষে এতগুলো দিন পর বাউডিহিতে নৃশংস মৃত্যুলীলা শেষ হয়ে একটা শুভ দিনের শুরু হতে চলেছে।

****

সকাল হতেই দেখা গেল সবার মেজাজ বেশ ফুরফুরে, এতদিন পরে সবাই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ইতিমধ্যে আগুন নিভিয়ে দেওয়া গেছে। জঙ্গলের কিছুটা অংশ পুড়ে গেছে। কারোর কারোর বাড়িরও একটু ক্ষতি হয়েছে। তবে নৃপতিবাবু আর ওঁর ছেলে যা দয়ালু মানুষ তাতে তাদের একবার বললে সাহায্য করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করবেন না তারা। যারা যারা মারা গেছে তাদেরকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোথাও একটা স্বস্তির মধ্যেও হালকা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে এখনও। স্বজনহারাদের কান্না। হয়তো এই বাউডিহি সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে গেল, শিবেন তাদের বাঁচিয়ে নিল কিন্তু তাদের প্রিয়জনরা যে চলে গেল না ফেরার দেশে, এই কষ্ট ভুলতে তাদের সময় লাগবে। তবে সময়ের সাথে সাথে যে-

কোনো ব্যথাই বিলীন হয়ে যায়। একদিন তারাও সবকিছু ভুলে আবার নতুন করে জীবনযুদ্ধে সামিল হবে।

এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু শিবেনের মুখের দুশ্চিন্তা পুরোপুরি কাটে না। বীরেন তাকে কারণ জিজ্ঞেস করে, "কী রে, এত উদাস হয়ে আছিস কেন? এখন তো সব ঠিক আছে। কত সুন্দর পরিবেশ এখন। সমস্ত এলাকা আজ এতদিন পরে স্বস্তির আনন্দে মেতে উঠেছে। তুই এত চিন্তার মধ্যে ডুবে আছিস কেন?"

শিবেন বলে, "দুশ্চিন্তার কারণ তো আছেই। যে নরকের দ্বার খুলে গিয়েছিল তার জন্য এক ভয়ানক বিপদ আসতে পারে। প্রতিমুহূর্তে আমি তা অনুভব করতে পারছি। সমস্ত নরকের দ্বার খুলে যাওয়ায় নরক থেকে বিভিন্ন ঋণাত্মক শক্তি যা মোটেই সামান্য শক্তিশালী নয় ভয়ানক শক্তিশালী সেই সমস্ত ঋণাত্মক শক্তি বেরিয়ে আসতে পারে এই পৃথিবীর বুকে। ফলে যে প্রলয়ের সৃষ্টি হবে তার ফল হবে মারাত্মক। বিভিন্ন জায়াগায় ভৌতিক, অলৌকিক, নৃশংস সব ঘটনা ঘটার প্রবণতা দেখা দিতে পারে এবং কত জায়গায় যে এইসব ঘটনা ঘটবে তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এইসব কিছুর জন্য দায়ী আমি। কিন্তু বাউডিহিকে বাঁচাতে আমাকে এটা করতেই হতো!"

বীরেন বলল, "চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর ওপর আমার পুরো ভরসা আছে। তুই যেমন ভাবে এটা ঠিক করলি ঠিক সেইভাবে তুই ওইগুলোও ঠিক করে দিবি। ওই খারাপ শক্তিগুলোকে পুনরায় নরকে পাঠিয়ে আবার দ্বার অবরুদ্ধ করে দিতে তুই-ই পারবি, আমি জানি। ওইসব এখন আর এত ভাবিস না!"

শিবেন ওর দাদার কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বীরেন বলল, "নে এবার একটু বিশ্রাম কর তো। অনেক ধকল গেল তোদের!"

শিবেন বলে উঠল, "আমার কাজ যে এখনও শেষ হয়নি!"

বীরেন তার কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আবার কীসের কাজ, সব তো মিটে গেল!"

শিবেন বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, আসল নাটক তো এবারে শুরু হবে! ওই দেখো, কে আসছে!"

শিবেনের চোখের ইশারা লক্ষ করে সেইদিকে তাকাতেই বীরেন দেখে শ্রীপতি বাবু তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে নগেন, হারান সবাই রয়েছে। শিবেনের কাছে এসেই তিনি এবং তার চ্যালারাও সবাই মিলে শিবেনকে এক প্রণাম ঠুকল।

নগেন বলে উঠল, "তোমায় যে কী বলে ধন্যবাদ দিই! তোমার কারণেই আমরা এত বড়ো

একটা বিপদ দিয়ে মুক্ত হতে পারলাম!"

হারান বলল, "আমি ভেবেছিলাম সত্যিই এই বুঝি শেষ আর বেঁচে ফেরা হবে না! কিন্তু শিবেন আমাদের বাঁচিয়ে নিল!"

শ্রীপতি বলে উঠল, "এই আনন্দেই তোমাকে আমার বাড়িতে আজ দুপুরে খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে এলাম। কোনো বারণ শুনব না। আসতেই হবে কিন্তু!"

শিবেন একটা চওড়া হাসি হেসে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আপনি এত কষ্ট করে এসেছেন আমায় নিমন্ত্রণ করতে আর আমি যাব না, এ হতে পারে? আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি ঠিক চলে যাব!"

শিবেনের কথা শুনে শ্রীপতিসহ সকলেই বেশ খুশি হয় এবং টুকটাক কিছু কথা বলে সেখান থেকে প্রস্থান করে। ব্যতিক্রম শুধু বীরেন। সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে শিবেনের দিকে! "হ্যাঁ রে এতদিন হল আমার বাড়ি এসছিস তুই, এতদিনে একবারও ভাত মুখে নিলি না আর তুই শ্রীপতিবাবুর বাড়ি যাবি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে?"

শিবেন বলল, "আজ দুপুরটা হতে দাও, সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে!"

শ্রীপতি শিবেনকে দেখে বলে উঠল, "আরে তুমি এসে গেছো। ভেতরে এস!"

শিবেন বলল, "আপনাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না! তা বাড়িতে কেউ নেই? আপনি একাই থাকেন নাকি?"

শ্রীপতি বলে, "না না, রামু থাকে তো আমার সাথে। আসলে দুদিন ধরে ওর মেয়ের শরীর একদম ভালো নেই তাই ও আসতে পারছে না। তবে আজকে আমার সাথে নগেন আছে! তুমি ভেতরে দাঁড়িয়ে কেন! এস! দাঁড়াও নগেনকে বলি এক গ্লাস শরবত করে আনতে, বাইরে যা গরম!"

এই বলে শিবেনকে বসিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল শ্রীপতি। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করে শিবেনের পায়ের সামনে প্রায় লুটিয়ে পরে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে রামু।

রামু বলে ওঠে, "আপনি আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিন, ও ছাড়া আমার এ জগতে আর কেউ নেই!"

শিবেন যেন এই মুহূর্তটার অপেক্ষাই করছিল, সে-ও বলল, "আমি তোমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দেব কিন্তু তার বদলে তোমাকে সমস্ত সত্যিটা সকলের সামনে বলতে হবে, রাজি?"

রামুও কাঁদতে কাঁদতে বলে, "হ্যাঁ আমি রাজি!"

এইসময় শ্রীপতি আর নগেন দুজনেই একত্রে ঘরে ঢোকে আর রামুকে দেখেই ওরা একটু চমকে যায়।

"একি রামু তুমি এখানে? তোমার মেয়ে কেমন আছে? এই নাও শিবেন, শরবতটা খেয়ে নাও!"

রামু শ্রীপতির প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে বসে থাকে। শিবেন বলে, "তার আগে একবার বাইরে চলুন। একটা বোঝাপড়া এখনও বাকি!"

শ্রীপতি একটু অবাক হয়ে বলে, "বোঝাপড়া! কীসের বোঝাপড়া?"

শিবেন বলে, "সেটা বাইরে গেলেই বুঝতে পারবেন!"

এই বলেই সে রামুকে নিয়ে হনহন করে বাইরে বেরিয়ে যায়। শ্রীপতি আর নগেন এক অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, কিছুই তাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু কোনো কথা না বলে তারাও বাইরে বেরিয়ে আসে আর তারপরেই শ্রীপতি চমকে দু-পা পিছিয়ে যায়। বাইরে বেশ বড়ো একটা গ্রামবাসীদের জটলা। কিন্তু যাকে দেখে শ্রীপতি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে সে সবার সামনেই দাঁড়িয়ে। নৃপতি রায় চৌধুরী। শ্রীপতির একমাত্র দাদা, এই গ্রামের ভূস্বামী।

সবাই জিজ্ঞাস্য চোখে শিবেনের দিকে চেয়ে থাকে। এবারে শিবেন বলতে শুরু করে, "ঠাকুরমশাই মারা যাওয়ার পর আপনারা সবাই পাঞ্চালীকে একঘরে করে দিয়েছিলেন। যে কিনা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপে আপনাদের প্রত্যেককে মায়ের মতো স্নেহ, ভালোবাসা দিয়েছিল তাকেই আপনারা ভুল বুঝলেন। ঠিকমতো দুদিন খেতে পর্যন্ত দিলেন না!"

গ্রামবাসীদের মধ্যেই কেউ একজন বলে উঠল, "মানছি ঠাকুরমশাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ওই মেয়েমানুষ একদম ভালো চরিত্রির ছিল না গো শিবেন!"

শিবেন দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, "চুপ করো। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া তোমরা আর কিচ্ছু বোঝো না। তোমাদের কি আমি চিনি না? তোমরা ১৫ বছর আগেও এক ছিলে আর এখনও সেই একই আছো। নিজেদের স্বার্থে ঘা পড়ল অমনি নিজেদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। অবশ্য যেখানে শ্রীপতির মতো লোকজন থাকে সেখানে তোমাদের মতো লোক থাকাও খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়!"

এবারে শ্রীপতি বেশ উচ্চস্বরে বললেন, "মানে কী বলতে চাইছ কী তুমি শিবেন?"

শিবেন এবারে চোখের ইশারায় ভীড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলেকে কী যেন একটা বলে আর তা বুঝেই দীপক ওরফে দীপু ও আরও কয়েকজন ছেলেদেরকে গিয়ে সে

কীসব বলাবলি করে নিয়ে গেল শ্রীপতিবাবুর বাড়ির পিছনের দিকটায়। তাদেরকে বাড়ির পিছনের দিকে যেতে দেখে শ্রীপতির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "আরে কী করছ কী? কোথায় যাচ্ছ তোমরা? ওইদিকে যেও না!"

শিবেন বলতে শুরু করল, "সেইদিন রাতে রাকাদের বাড়ি থেকে ফেরার সময় হঠাৎই দীপুর সাথে আমার ধাক্কা লাগে। অত রাতে দীপুকে দেখে তো আমি অবাক। দীপুকে বেশ সাহসী বলতে হয়। যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ পিশাচের ভয়ে জবুথবু হয়েছিল সেখানে একা অত রাতে দীপু ওখানে কী করছিল? ওকে জাপ্টে ধরতেই ব্যাটা আসল কথা বলল। ও যখনই সুযোগ পায় শ্রীপতির বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারে। ও নাকি একবার রামুকে জিজ্ঞেস করেছিল, যে রামু সারাদিন এখানে-ওখানে পরিষ্কার করে বেড়ায়, নিজের হাতে বাগানের পরিচর্যা করে, বাড়ির সামনে কেউ ময়লা ফেললেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে সেখানে শ্রীপতির বাড়ির পিছনের বাগানের গাছপালা যখন মানুষের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে ঝোপ জঙ্গলের আকার নেয় তখন সন্দেহ একটু হয় বই-কি। একদিন উঁকি মারতে গিয়ে রামুর হাতে ধরা পড়ে যায় সে, কিন্তু একটুও ভয় না পেয়ে রামুকে চেপে ধরে। রামুকে বাগানের দিকে নিয়ে যেতে বললে সে কিছুতেই রাজি হয় না। সেদিন শ্রীপতি বাড়ি ছিলেন না। সেই সুযোগে দীপু জোড় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাগানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে আর তখনই সে দেখতে পায় একটা জায়গায় বেশ খানিকটা মাটি খোঁড়া আর সেখানে কিছু পচা ফুল, সিঁদুর পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো পূজার আচারবিধি করা হয়েছে ওখানে। সেটা দেখেই মনে আরও সন্দেহ হয় দীপুর। গ্রামের লোকেরা খুব ভালো মতোই জানে যে শ্রীপতি বাবুর অত ঠাকুরদেবতায় ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, সেখানে তিনি বাড়ির পিছনে পুজো করলেন? তা কেউ জানতেও পারল না?

দীপুকে তখন রামু বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে দিলেও তারপর থেকেই দীপু শ্রীপতিদের বাড়ির ওপর নজর রাখতে শুরু করে। আর সেই দিন সে একই কাজে সেখানে গিয়েছিল কিন্তু অন্ধকারে বুঝতে না পেরে আমাকে ধাক্কা মেরে দেয় এবং তারপর আমি জোড় করলে পর পুরো কথাটা তাকে খুলে বলে! অনাথ ছেলে, পৃথিবীতে ওর আপন কেউ নেই। তাই নিজের মৃত্যুর পরোয়াও তার নেই! আজ ও না থাকলে সত্যি হয়তো এত বড়ো সত্যিটা কখনওই সামনে আসত না!"

গ্রামবাসীরা এবারে সবিস্ময়ে সমস্বরে বলে ওঠে, "কী কী? কী সেই সত্যি?"

"তোমরা এখনও বুঝতে পারলে না ওই বাগানে কী আছে? ওই বাগানেই পোঁতা আছে

পাঞ্চালীর দেহ!"

শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ করেই বজ্রপাত হল যেন। বিস্ময় নিয়ে সবাই একে অপরের দিকে চাইতে লাগল। নৃপতির চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায় এই মুহূর্তে তার মনের অবস্থাখানা। কিন্তু এবারে হঠাৎই শ্রীপতি বলে, "চুপ করো, কীসব বলছ তুমি? মিথ্যেবাদী, ভণ্ড। তোমাকে আমি ছাড়ব না, তোমার শেষ না দেখে..." কথাটা শেষও করতে পারেন না তিনি তার আগেই তার গালে সপাটে একটা চড় কষিয়ে দেন নৃপতি। এরই মাঝে দীপু এসে খবর দেয় বাগানে খোঁড়াখুঁড়ি শেষ। সবাই মিলে পিছনে পৌঁছাতেই হকচকিয়ে যায়। সেখানে সত্যিই মাটিতে একটা কঙ্কাল পুঁতে রাখা হয়েছিল এতদিন। একটা তীব্র পচা গন্ধ সেখান থেকে নির্গত হচ্ছে। এবারে রামু আর চুপ থাকতে পারে না, কান্নায় ভেঙে পড়ে, "সেইদিন পাঞ্চালীর কোনো দোষ ছিল না। ঠাকুরমশাই এসে যে দুজনকে পাঞ্চালীর ঘরে দেখেছিলেন সেই দুজন শ্রীপতি বাবু আর নগেন দাই ছিলেন। সেইদিন তিনি ওখানে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে হয়তো তিনি পাঞ্চালীকে এই ভুলটা বুঝে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেন না। পাঞ্চালীর কোনো চরিত্রের দোষ ছিল না। বরং তাকে জোড় করেই!" আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে সে, "দুদিন খেতে না পেরে বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছিল পাঞ্চালী। আর সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে শ্রীপতি আর নগেন মিলে ওকে ধর্ষণ করে। সে এই অপমান কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই তখনই সে নিজের প্রাণ ত্যাগ করে। রাতের অন্ধকারে তার দেহ নিয়ে এসে এখানে পুঁতে দেয় ওরা আর এই ঘটনাটা কোনোভাবে প্রকাশ জেনে গিয়েছিল। তাই সেদিন রাতে ওর খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয় শ্রীপতিবাবু! আমি সব জেনেও কিছু করতে পারিনি। আমি এক হতভাগ্য পিতা, সব জেনেও নিজের মেয়েকে বাঁচাতে আমি এই পাপিষ্ঠগুলোকে এতদিন সবার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ যখন আমার মেয়েও নেই তখন আর আমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!" এই বলে এবারে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

শিবেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামুর কাছে এগিয়ে যায়, তারপর তার কাঁধ ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করে! "বললাম না মানুষ স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। তুমি যেমন তোমার মেয়ের স্বার্থে এতদিন এদের বাঁচিয়ে এলে আর আজ তোমার মেয়ে নেই বলে ওদের সমস্ত কুকর্ম ফাঁস করে দিলে। পাঞ্চালীর সাথে ঘটা ঘটনা তো তোমার মেয়ের সাথেও হতে পারত কিংবা গ্রামের অন্য মেয়ের সাথেও হতে পারত তখনও কি তুমি চুপ করে থাকতে পারতে? ওইদিকে তাকিয়ে দেখো, সে-ও এক হতভাগ্য পিতা যাকে তার মেয়ের দেহাবশেষ নিজের চোখের সামনে দেখতে হয়। তার এখন কী অবস্থা তা তুমি অনুভব করতে পারছ?"

পাঞ্চালীর বাবার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শেষের কথাগুলো বলে ওঠে শিবেন। সে বুঝি কাঁদতেও ভুলে গেছে। স্তব্ধ হয়ে একভাবে চেয়ে আছে মাটিতে পড়ে থাকা পাঞ্চালীর দেহাবশেষের দিকে। রামুও মুখ নীচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ একটা চেনা গলার স্বরে "বাবা" শুনতেই সে থতমত খেয়ে যায়। তার মেয়ে মুন্নি এসেছে, তার দিকে তাকিয়ে হাসছে খিলখিল করে। এ কী করে সম্ভব। একটু আগেই তো সে দেখল তার শরীর বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, শরীরে এতটুকু প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে সে কি স্বপ্ন দেখছে, তবে কি মেয়ের শোকে তার মানসিক বিকারগ্রস্ততা দেখা দিল।

শিবেন বলল, "আমি জানতাম তোমার মেয়ে অসুস্থ ছিল। তুমি পাশের গ্রামে যে কবরেজের থেকে ওষুধ নিতে তার ওষুধ বদলে আমার তৈরি করা একটা ওষুধ রেখে দিই। অবশ্যইই দীপু আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে। এই ওষুধ খাওয়ার ফলে তোমার মেয়ের শরীর আরও খারাপ হতে শুরু করে। কবরেজও হাত তুলে দেয়। ধীরে ধীরে তোমার মেয়ের শরীর মৃত মানুষের মতো ঠান্ডা হয়ে যায় আর তুমি ধরেই নাও যে তোমার মেয়ে মারা গেছে। আমি জানতাম তোমার মেয়ে তোমার ভীষণই দুর্বল একটা জায়গা। সত্যিটা সবার সামনে আনার জন্য আমাকে এটা করতেই হতো। তবে চিন্তা করো না তোমার মেয়ে এখন পুরোপুরি সুস্থ!" শিবেনের কথা শেষ হতেই রামু গিয়ে তার মুন্নিকে জড়িয়ে ধরে। ওইদিকে নৃপতি তার লেঠেলদের শ্রীপতি আর নগেনকে কুঠুরিতে চিরকালের জন্য বন্দি করার আদেশ দিয়ে সবার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। পাঞ্চালীর দেহাবশেষ নিয়ে যাওয়া হয় সৎকার করার জন্য। সকলেই অশ্রুসিক্ত চোখে পাঞ্চালীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কেউ দেখতে না পেলেও শিবেন ঠিকই দেখে দূরে আকাশের দিকে দুটো অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারা শিবেনের দিকে তাকিয়ে একটা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হাসি জ্ঞাপন করে এবং পরমুহূর্তেই তারা বাতাসে মিলিয়ে যায়। সবকিছু মিটে যেতেই এবারে বীরেন একটা বড়োসড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তীর্থ বলে, "নীল, আজ না একটু মাটন খেতেই হবে। ভাই দেখ, অনেক খাটাখাটুনি গেছে। একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছি। এবারে মাটন না খেলে আমি শুকিয়েই মরে যাব!"

নীল চোখ পাকিয়ে বলে, "তোর হ্যাংলামি আর গেল না!"

সবাই ওদের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। বীরেন বলে, "তোমার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ আমি করব। আজ রাতেই একদম দেশি পাঠার ঝোল, তোমার জন্য স্পেশাল!"

এই শুনে তীর্থ বীরেনকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে, "ওহ বীরেনদা তুমি বেস্ট!"

তীর্থের কাণ্ড দেখে পুনরায় হাসির রোল ওঠে সেখানে। তারপর একে একে সকলে মিলে

পা বাড়ায় বীরেনের বাড়ির উদ্দেশে।

(সমাপ্ত)